POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۭ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (المائدہ:74)

নিশ্চয় তাহারা কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ তিনের মধ্যে তৃতীয়'; অথচ এক মা'বুদ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। এবং তাহারা যাহা বলিতেছে উহা হইতে তাহারা যদি নিবৃত্ত না হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করিবে।

(আল মায়েদা: ৭৪)

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلّی علی رسولہ الکریم وعلیٰ عبدہ المسیح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10 সংখ্যা 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 6 Mar 2025 5 -ই রমজান 1446 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

বয়আতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল,বয়আতকারী নিজের মাঝে সত্যিকার পরিবর্তন সৃষ্টি করবে এবং হৃদয়ে খোদার ভয় লালন করবে আর প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করে নিজ জীবনে এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করে দেখাবে।

কলেমার প্রকৃত অর্থ হল, মুখে স্বীকার করা এবং হৃদয় দ্বারা সত্যায়ন করা যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রভু এবং আমার প্রেমাস্পদ অন্য কেউ নয়। এই কলেমা পবিত্র কুরআনের সমস্ত শিক্ষার সারাংশ যা মুসলমানদেরকে শেখানো হয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণীঃ

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: "আমি বহুবার একথা বলেছি, বাহ্যিক নামের দিক দিয়ে আমাদের জামা'ত এবং অপরাপর মুসলমান সমান সমান।তোমরাও মুসলমান, তারাও মুসলমান বলে আখ্যায়িত।তোমরাও কলেমা পাঠকারী, তারাও কলেমা পাঠকারী। তোমরাও কুরআনের অনুষরণের দাবী করে থাক, তারাও কুরআনের অনুসরণের দাবী করে থাকে। মোটকথা দাবীর দিক দিয়ে তারাও তোমরা সমান কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কেবল মৌখিক দাবিতেইসন্তুষ্ট হন না, যতক্ষণ এর সত্যতা প্রতিভাত না হয় আর দাবীর স্বপক্ষে আমল ও অবস্থার পরিবর্তন না হবে। এটি ভেবে অধিকাংশ সময় আমি গভীর মর্মযাতনায় নিপতিত হই।বাহ্যিকভাবে জামা'তের সদস্য সংখ্যা বেড়ে চলেছে। চিঠি-পত্রের মাধ্যমে বা লোকেরা উপস্থিত হয়ে বয়আত করছে ফলে প্রতিদিন এই সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আজকের ডাকেও বয়আতকারীদের এক বিরাট তালিকা আমার হাতে এসেছে। কিন্তু বয়আতের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পুরোপরি জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক এবং তদনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। বয়আতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল,বয়আতকারী নিজের মাঝে সত্যিকার পরিবর্তন সৃষ্টি করবে এবং হৃদয়ে খোদার ভয় লালন করবে আর প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করে নিজ জীবনে এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করে দেখাবে। এছাড়া বয়আত করে কোনো লাভ নেই কেননা এ বয়আত তার জন্য আযাবের কারণ হবে আর অঙ্গীকার করে জেনে-বুঝে এবংভেবে-চিন্তে অবাধ্যতা করা ভয়ানক পাপ।আমার একথা ভালভাবে জানা আছে, এসব কথা কারও হৃদয়ে প্রতিস্থাপন করা আমার কাজ নয় অথবা আমার কাছেএমন কোনো যন্ত্র নেই যা দিয়ে আমি আমার কথা কারও হৃদয়ে প্রতিস্থাপন করতে পারি তবে এটি কেবল আমার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় বরং সকল নবী-রসূলের জন্য প্রযোজ্য। 'ইন্নাকা লাতাহদী মান আহবাবতা' (তুমি কাউকে ভালবাসলেই তাকে হেদায়েত দিতে পারবে না) যেক্ষেত্রে এই বাণী মহানবী(সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল সেক্ষেত্রে এমন কোন মহারথি আছে যে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী কাউকে হেদায়েতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে? উপদেশ দেয়া এবং বাণী পৌঁছে দেওয়া আমার দায়িত্ব। আমি দেখছি এই জামা'ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। অনেক সময় জামা'তের সদস্যদের নিষ্ঠা, ভালবাসা এবং ঈমানের স্পৃহা দেখে আমি নিজেও অবাক হয়ে যাই এমনকি শত্রুপক্ষও হতবাক হয়ে যায়। এ জামা'তের হাজার হাজার সদস্য নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় অনেক উন্নতি করেছে কিন্তু অনেক সময় পুরোনো অভ্যাসের বশবতী হয়েঅথবা মানবীয় দুর্বলতার কারণে জাগতিক বিষয়াদীতে এতটাই মগ্ন হয়ে যায় ফলে ধর্মীয় বিষয়ে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। আমার আকাঙ্খা হল, এমন পবিত্র ও নিঃস্বার্থ হয়ে যাও যেনধর্মের মোকাবেলায় জাগতিকতা মূল্যহীন মনে হয় আর বিভিন্ন ধরনের এমন দুর্বলতা যা খোদা থেকে দূরত্ব এবং অন্তরায় সৃষ্টি করে তা যেন দুর হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়গুলো সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অবস্থা ভয়াবহ এবং নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত বিষয়গুলোর কণাসমও থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যেকোনো সময় এ বিষয়গুলো ঘনীভূত হয়ে আমল ধ্বংস হওয়ার শঙ্কা আছে।"

কলেমার তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন: "কলেমার প্রকৃত অর্থ হল, মুখে স্বীকার করা এবংহৃদয় দ্বারা সত্যায়ন করা যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রভু এবং আমার প্রেমাস্পদ অন্য কেউ নয়। এই কলেমা পবিত্র কুরআনের সমস্ত শিক্ষার সারাংশ যা মুসলমানদেরকে শিখানো হয়েছে।একটি বৃহৎ পুস্তক মনে রাখা সহজ ব্যপার না। তাই এই কলেমা শেখানো হয়েছে যেন সর্বদা মানুষ ইসলামী শিক্ষার মূল নির্যাস দৃষ্টিতে রাখে আর যতক্ষণ পর্যন্ত এই মূল তত্ত্ব মানুষের মাঝে সৃষ্টিনা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিই মুক্তি লাভ হবে না। আর এ কারণেই মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে বলবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ে যে'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' স্বীকার করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল।...এর অর্থ হল, এই কলেমার মাঝে যে প্রকৃত অর্থ নিহিত রয়েছেতো ব্যবহারিকভাবে মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করতে হবে। যখন এ বিষয়টি সৃষ্টি হয়ে যায় তখন এমন মানুষ প্রকৃতপক্ষেই জান্নাতে প্রবেশ করে। কেবল মৃত্যুর পরেই নয় বরং ইহকালেও সে জান্নাতে থাকে। একথা সত্য এবং শিঘ্রই অনুধাবন করা যায় যে, আল্লাহ্ ভিন্ন মানুষের যখন আর কোনো প্রেমাস্পদ এবং উদ্দেশ্য না থাকে তখন কোনো দুঃখ তাকে কষ্ট দিতে পারে না।ওলী-আউলিয়া এবং গওস-কুতুবগণের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। আপনাদের হয়তো মনে হতে পারে, আমরা আবার কখন মূর্তিপূজা করলাম? আমরা তো আল্লাহ্‌র-ই ইবাদত করি। স্মরণ রাখবেন! মানুষ যদি মূর্তিপূজা না করে, তবে এটি সাধারণ বিষয়। হিন্দু ধর্মের ঐসকল অনুসারী যারা প্রকৃত সত্যের কোনো খবর রাখে না, তারাও এখন মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করছে।...যে-ব্যক্তি আত্মপূজায় লিপ্ত অথবা নিজের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে এবং এর জন্য মরতেও প্রস্তুত, এমন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মূর্তিপূজারী এবং মুশরেক। কোনো ব্যক্তি যদি কেবল উপকরণের ওপর ভরসা করে তবে এটিও এক ধরনের মূর্তিপূজা। এ ধরনের মূর্তিপূজা যক্ষার ন্যায় যা ভিতরে ভিতরে মানুষকে শেষ করে দেয়। বড় বড় মূর্তি তো সহজেই চেনা যায় এবং তা থেকে মুক্ত হওয়া সহজ এমনকি আমি নিজে দেখেছি, লক্ষ লক্ষ মানুষ এসব মূর্তি পরিহার করেছে এবং করছে। এ উপমহাদেশ যা হিন্দু দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, সব মুসলমান তাদের মধ্য থেকেই ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয় নি? তারা মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করেছে কি করে নি? এমনকি হিন্দুদের মাঝ থেকেওএমনসব ফির্কার উদ্ভব হচ্ছে যারা এখন আর মূর্তিপূজা করে না। মূর্তিপূজার সংজ্ঞা এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। একথা সত্য, তারা বাহ্যিক মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করেছে তবু এখনও কথিত যুক্তিবিদও দার্শনিক নিজেদের অভ্যন্তরে হাজার হাজার মূর্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং তা কোনোক্রমেই বের করতে পারে না। প্রকৃতবিষয় হল, আল্লাহ্‌র কৃপা ছাড়া এই জীবাণু ভিতর থেকে বের হয়না। এটি এক সূক্ষ্ম জীবাণু এবং এটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক।যারা উত্তেজনার বশে আল্লাহ্‌র অধিকার এবং সীমারেখা অতিক্রম করে ফেলে এবং এমনইভাবে বান্দার অধিকারও খর্ব করে তারা অশিক্ষিতও না বরং তাদের মাঝে হাজার হাজার মৌলভী ফাযেল ও আলেম আছে এবং অনেকে এমন থেকে থাকবে যারা ফকীহ এবং সূফী নামে প্রসিদ্ধ, এতদসত্ত্বেও তারাও এই রোগে আক্রান্ত। এসব মূর্তি পরিহার করাই তো বীরত্ব এবং সেগুলো সনাক্ত করাই পরম বিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতা।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৩৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

হে মুহাম্মদ (সা.)! আমি মানুষের ভয় করতাম না, কিন্তু যখন আমি আপনাকে (সা.) দেখি তখন আমার বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় আর (আমার) হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়ে। অতঃপর আমি আমার সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভাবলাম যা করার আমার দৃঢ় সংকল্প ছিল, যার জন্য অনেক আরোহী চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কেউ সফল হয় নি। আমি বুঝতে পারি যে, আপনার নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে এবং নিশ্চয় আপনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। (জনৈক আক্রমণকারীর স্বীকারোক্তি)

রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমর বিন উমাইয়া এবং সালামা বিন আসলামকে আবু সুফিয়ান বিন হারব-দিকে প্রেরণ করে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা যদি তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাও তবে তাকে হত্যা করো।

উসায়ের বিন যিরাম অভিমুখে সারিয়্যা আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা এবং সারিয়া আমার বিন উমাইয়া যামরি=র প্রেক্ষাপটে সীরাতে নববী (সা.)

মাননীয় শেখ মুবারক আহমদ সাহেব (নাযির দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, রাবোয়া), মাননীয় মহম্মদ মুনীর ইদালবী সাহেব (সিরিয়া) এবং মাননীয় আব্দুল বারী তারিক সাহেব (ইনচার্জ কম্পিউটার সেকশন, ওয়াকফে জাদীদ, রাবোয়া)-এর স্মৃতিচারণ এবং গায়েবানা জানাযা।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় শেখ মুবারক আহমদ সাহেব ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসেবে অতি উত্তমভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। যখন সদর আঞ্জুমানে ছিলাম আমিও তাকে দেখেছি, আমার সাথেও তিনি কাজ করেছেন। সর্বদা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়ে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ছিলেন। সাদামাটা জীবন কাটানো, অনাড়ম্বর জীবনযাপন এবং জামাতের কাজে পুরো সময় সময় দেওয়া ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য।

পাকিস্তানের আহমদীদের অনেক দোয়া করা প্রয়োজন, এদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

ফিলিস্তীনীদের জন্য দোয়া করাও আবশ্যক এবং মুসলমানদের বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য চেষ্টাও করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম জাতিকেও সেই বোধবুদ্ধি দান করুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৭ই জানুয়ারী, ২০২৫,এর জুমুআর খুতবা (১৭ই সুলাহ,১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ যেসব সারিয়্যা বা সেনাভিযানের উল্লেখ করা হবে সেগুলোর একটি হলো আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহার সেনাভিযান যা উসায়ের বিন রিযামের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল;এর উল্লেখ প্রথমে করা হবে। আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহার এই সেনাভিযান ৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল (মাসে) উসায়ের অথবা উসায়ের বিন রিযাম-এর সাথে খায়বারে সংঘটিত হয়েছিল। এরবিস্তারিত বিবরণ হলো, যখন আবু রা'ফে সালাম বিন আবিল হুকায়েককে হত্যা করা হয়েছিল তখন ইহুদীরা উসায়ের বিন রিযামকে নিজেদের আমীর মনোনীত করে। সে ইহুদীদের মাঝে দণ্ডায়মান হয়ে বক্তব্য প্রদান করে যে, আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ (সা.) যখনই ইহুদীদের মধ্য হতে কারো বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়েছেন অথবা নিজ সাথিদের মধ্য থেকে কাউকে প্রেরণ করেছেন, তখন যে কাজের সংকল্পই করেছেন- তাতে সফল হয়েছেন। কিন্তু আমি সেই কাজ করব যা আমার সাথিদের মধ্য হতে কেউই করে নি। ইহুদীরা জিজ্ঞেস করে, তুমি কী করতে চাও? উসায়ের বিন রিযাম বলে, আমি গাতাফান গোত্রের কাছে যাচ্ছি এবং তাদেরকে জড়ো করছি, আর আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর উদ্দেশ্যে গিয়ে তার বাড়িতে প্রবেশ করব। যখনই কেউ তার শত্রুর বাড়িতে গিয়ে আক্রমণ করে তখন সে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে কিছুটা হলেও সফল হয়েই থাকে। ইহুদীরা বলে, তোমার চিন্তা-ভাবনা খুবই উত্তম। এরপর সে গাতাফান এবং অন্যান্য গোত্রের কাছে যায় এবং তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যেসমবেত করতে আরম্ভ করে। এই সংবাদ মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি (সা.) এর স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-কে তিনজন সঙ্গীসহ রমযান মাসে গোপনীয়তার সাথে প্রেরণ করেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১১১)

এর বিশদ বিবরণে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, মহানবী (সা.) যখন এই অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন তখন তিনি দ্রুত তাঁর একজন আনসারী সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-কে অন্য তিনজন সাহাবীসহ খায়বার অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন, সংগোপনে যাবে এবং সার্বিক পরিস্থিতি অবগত হয়ে দ্রুত ফিরে আসবে। অতএব, আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) এবং তার সঙ্গীরা যান এবং চুপিসারে সার্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি অবগত হয়ে এবং এ সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ফিরে আসেন। বরং আব্দুল্লাহ্ বিন র ওয়াহা (রা.) এবং তার সঙ্গীরা এমন সর্তকার সাথে কাজ করেন যে, খায়বারের দুর্গগুলোর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে এবং উসায়ের বিন রিযামেরবৈঠকস্থলের কাছে গিয়ে স্বয়ং উসায়ের ও তার সঙ্গীদের মুখ থেকে একথা শোনেন যে, তারা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অমুক অমুক ষড়যন্ত্র করছে। ঐ দিনগুলোতে একজন অমুসলমান ব্যক্তি খারেজা বিন হুসায়েল ঘটনাক্রমে খায়বার থেকে মদীনায় আসে আর সে-ও আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-র সত্যায়ন করে এবং বলে, আমি উসায়েরকে এই অবস্থায় দেখে এসেছি যে, সে মদীনায় আক্রমণ করার জন্য তার সৈন্যবাহিনী একত্রিত করছে।

এই সত্যায়নের পর মহানবী (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-র নেতৃত্বে ত্রিশজন সাহাবীর একটি দল খায়বার অভিমুখে প্রেরণ করেন। যদিও রেওয়ায়েত থেকে এটি জানা যায় না যে, মহানবী (সা.) সেই দলকে কী কী নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন, কিন্তু সেই আলোচনা থেকে যা খায়বারে আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) এবং উসায়ের বিন রিযামের মাঝে হয়েছিল তা থেকে অনুধাবন যায় যে, মহানবী (সা.)-এর অভিপ্র ায় ছিল, উসায়েরকে মদীনায় ডেকে এনে তার সাথে এমন কোনো সমঝোতা (চুক্তি) করা যেন এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটে এবং দেশে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই বাসনা বাস্তবায়নের জন্য তিনি (সা.) উসায়েরকে যদি খায়বার অঞ্চলের নেতা হিসেবেও মেনে নিতে হয় তবে এই শর্তে মেনে নিতে প্রস্তু ত ছিলেন যে,ভবিষ্যতে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-র দলটি খায়বারে পৌঁছার পর তারা সর্বপ্রথম উসায়ের বিন রিযামের কাছ থেকে আলোচনা চলাকালীন

শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নেয় যা থেকে বোঝা যায়, সে সময় (বিপদের) আশঙ্কা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, মুসলমানরা মনে করত (পাছে) কোথাও এই সংলাপের মাঝেই না আবার উসায়েরের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। উসায়ের অঙ্গীকার করে যে, এমনটি হবে না।কিন্তু একই সাথে নিজের মানসম্মান বজায় রাখতে সে আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-র নিকট থেকেও একই ধরনের অঙ্গীকার নেয় যে, তিনিও কোনো ক্ষতি করবেন না। তবে এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-র পক্ষ থেকে প্রথমে পদক্ষেপ গ্রহণ করা স্পস্ট করে, সত্যিকার বিপদের আশঙ্কা কার পক্ষ থেকে ছিল। যাহোক, এই কথা ও অঙ্গীকারের পর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) উসায়েরের সাথে আলোচনা শুরু করেন যার সারকথা এটি ছিল, মহানবী (সা.) তোমাদের সাথে একটি শান্তিচুক্তি করতে চান, যেন এই পারস্পরিক যুদ্ধের অবসান ঘটে আর এর জন্য সর্বোত্তম পন্থা হলো, তুমি স্বয়ং মদীনায় গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে সামনাসামনি কথা বলো। যদি এই ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহলে আমি আশা রাখি, মহানবী (সা.) তোমাদের সাথে অনুগ্রহসুলভ আচরণ করবেন আর হতে পারে, তোমাকে রীতিমত খায়বারের শাসক বা নেতা হিসেবে মেনে নেওয়া হবে। উসায়ের, যে ক্ষমতালোভী ছিল, অথবা হতে পারে তার হৃদয়ে অন্য কোনো প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়ও ছিল- (সে) এই প্রস্তাব পছন্দ করে বা নিদেনপক্ষে প্রকাশ করে যে, আমার এই প্রস্তাব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু একইসাথে সে খায়বারের ইহুদী নেতাদের সমবেত করে তাদের কাছেও পরামর্শ চায় যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব এসেছে; এখন এ বিষয়ে কী করা যায়? ইহুদীরা, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতায় অন্ধ ছিল, মোটের ওপর তারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আর তারা উসায়েরকে তার এই অভিপ্রায় থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে বলে, মুহাম্মদ (সা.) তোমাকে খায়বারের আমীর হিসেবে স্বীকার করে নেবে বলে আমাদের মনে হয় না। কিন্তু উসায়ের, যে সার্বিক পরিস্থি তি সম্পর্কে বেশি অবহিত ছিল, সে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকে এবং বলে, তোমরা জানো না; মুহাম্মদ (সা.) যুদ্ধ করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেছেন। তাই তিনি মনেপ্রাণে চান, যে-কোনো উপায়ে এই যুদ্ধের অবসান ঘটুক।

মোটকথা, উসায়ের বিন রিযাম আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-র দলের সাথে মদীনায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় আর আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-র মতো সে-ও নিজের সাথে করে ত্রিশজন ইহুদীকে নিয়ে নেয়। এই দুই দল যখন খায়বার থেকে যাত্রা করে খায়বার থেকে ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত কারকারা নামক স্থানে পৌঁছে তখন উসায়েরের সংকল্প বদলে যায়, অথবা তার উদ্দেশ্য যদি আগে থেকেই মন্দ হয়ে থাকে তাহলে এটি ধরে নিতে হবে যে, তখন তা প্রকাশের সময় এসে যায়। যেমন, সে কথা বলতে বলতে অনেক ধূর্ততার সাথে মুসলমানদের দলের একজন সম্মানিত ব্যক্তি আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস আনসারী (রা.)-র তরবারির দিকে হাত বাড়ায়। আব্দুল্লাহ্ তখনই বুঝে যান যে, এই দুর্ভাগার নিয়্যত বদলে গেছে! কাজেই তিনি দ্রুত তার উটকে হাঁকিয়ে সামনে এগিয়ে যান এবং পেছনে ফিরে উসায়েরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে আল্লাহ্র শত্রু! তুমি কি আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাও?' আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস (রা.) দুইবার এই বাক্য পুনারাবৃত্তি করেন কিন্তু উসায়ের (এর) কোনো উত্তর দেয় নি কিংবা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টাও করে নি, উপরন্তু সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। এটি সম্ভবত ইহুদীদের মধ্যে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ইঙ্গিত ছিল যে, এমন (মোক্ষম) সুযোগ এলে সবাই মিলে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অতএব, সেখানে পথিমধ্যেই মুসলমান এবং ইহুদীদের মধ্যে তরবারির ঝংকার শুরু হয়ে যায় অর্থাৎ যুদ্ধ বেধে যায়। আর যেহেতু উভয় দলই সংখ্যায় সমান ছিল এবং ইহুদীরা আগে থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল আর মুসলমানরা একেবারেই অপ্রস্তুত ছিল অর্থাৎ তাদের মধ্যে যুদ্ধের কোনো অভিপ্রায় ছিল না, তথাপি আল্লাহ্ তা'লার এমন অনুগ্রহ হয় যে, কোনো কোনো মুসলমান আহত হলেও তাদের মধ্যে কারো প্রাণহানী হয় নি। কিন্তু অপরদিকে সকল ইহুদী নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার স্বাদ আস্বাদন করে মাটিতে মিশে যায়। যখন সাহাবীদের এই দলটি মদীনায় ফেরত আসে এবং মহানবী (সা.) অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন, তখন তিনি (সা.) মুসলমানদের নিরাপত্তা ও তাদের বেঁচে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, قَدْ نَجّٰكُمُ اللّٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ (আল্লাহ্র) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো! কেননা আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে এই অত্যাচারী দলের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এ ঘটনা সম্পর্কে কতক খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক এই আপত্তি করেছে যে, আব্দুল্ল াহ্ বিন রওয়াহার দল পথিমধ্যে সুযোগ মতো হত্যা করার উদ্দেশ্যেউসায়ের ও তার সাথিদেরকে খায়বার থেকে বের করে এনেছিল। আপত্তিটি পশ্চিমা গোঁয়ার্তুমির এক অপছন্দনীয় বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু ই নয়। ইসলামের ওপর আপত্তিকারীরা মুখে যা আসে তা-ই বলে থাকে। কেননা যেমনটি ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে,ইতিহাসে এর কোনো প্র মাণ পাওয়া যায় না যে, মুসলমানরা এ উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে গিয়েছিল। বরং লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ বাদ দিলেও কেবল আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস (রা.)-র এই বাক্য- 'হে আল্লাহ্র শত্রু! তুমি কি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাচ্ছো?' আর সেইসাথে মহানবী (সা.)-এর উক্তি- 'কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো! কেননা আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে এই অত্যাচারী দলের হাত থেকে রক্ষা করেছেন'- একথা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, মুসলমানদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও শান্তিপূর্ণ ছিল আর যা কিছু ঘটেছে তা কেবলমাত্র সেই বিশ্বাসঘাতকতার ফলাফল ছিল যা ইহুদীরা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী মুসলমানদের সাথে করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটিকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে বর্তিয়েছেন। "

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৭৩৯-৭৪১)

যাহোক, এই অভিযানের ফলাফল এটিই হয়েছিল।

এরপর রয়েছে আমর বিন উমাইয়্যা যামরীর অভিযান, যা আবু সুফিয়ানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। ইবনে হিশাম, ইবনে কাসীর, তাবারী প্রমুখ এই অভিযানকে চতুর্থ হিজরী সনের অধীনে রাজী-র ঘটনার পর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনে সা'দ এই অভিযানকে ৬ষ্ঠ হিজরী সনের অভিযানসমূহের অধীনে উল্লেখ করেছেন। যুরকানীও ইবনে সা'দের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়ে ৬ষ্ঠ হিজরী সনের অধীনে এই অভিযানের উল্লেখ করেছেন।

(সূত্র: আসসীরাতুন নববীয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮৮৫) (আস সীরাতুন নববীয়াহ লি ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩৫) (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭৯) (তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭১-৭২) (যারকানি, ৩য় খন্ড, পৃ: ১৬৬-১৬৯)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও সীরাত খাতামান নবীঈন পুস্তকে এই অভিযানকে ৬ষ্ঠ হিজরী সনের বলে উল্লেখ করেছেন এবং বিস্তারিত বিবরণে লিখেছেন: "এই অভিযানের সময়কাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে হিশাম এবং তাবারী এটিকে ৪র্থ হিজরী সনের বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ইবনে সা'দ এটিকে ৬ষ্ঠ হিজরী সনের বলে উল্লেখ করেছেন। আর আল্লামা কাস্তালানী এবং যুরকানী ইবনে সা'দের বর্ণনাকেই প্রধান্য দিয়েছেন। তিনি লেখেন, আমিও এটিকে ৬ষ্ঠ হিজরী সনের উল্লেখ করেছি, বাকি আল্লাহ্ তা'লা সবচেয়ে ভালো জানেন। ইবনে সা'দের বর্ণনার মূল বিষয়বস্তুর সমর্থন বায়হাকীও করেছেন, কিন্তু তাতে এই ঘটনার সময়কাল সম্পর্কে জানা যায় না।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৭৩৯-৭৪১)

এই অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ হলো, আবু সুফিয়ান কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন ব্যক্তিকে বলে, তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ নেই যে মুহাম্মদ (সা.)-কে বাজারে ঘোরাফেরা করার সময় অতর্কিতে হত্যা করবে? অতএব আবু সুফিয়ানের নিকট বেদুইনদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তার বাড়িতে আসে এবং বলে, তুমি আমাকে লোকজনের মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালী হৃদয়ের অধিকারী পাবে। আমি যখন কাউকে পাকড়াও করি শক্তিশালীহাতে পাকড়াও করি এবং আমি সবচেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারি। তুমি যদি আমাকে সাহায্য করো তাহলে আমি তাদের কাছে যাব এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করব। আর আমার কাছে একটি ছুরি আছে যা শুকুনের পালকের ন্যায়। সেটি দিয়ে আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করব আর এরপর আমি কোনো কাফেলায় আত্মগোপন করব আর পালিয়ে সেখান থেকে চলে আসব, কেননা আমি রাস্তাঘাট সম্পর্কে খুবই অভিজ্ঞ। আবু সুফিয়ান বলে, তুমিই এই কাজের উপযুক্ত লোক! অতঃপর আবু সুফিয়ান তাকে উট এবং পাথেয় প্রদান করে এবং বলে, নিজের উদ্দেশ্যকে গোপন রাখবে। সেই ব্যক্তি রাতে বের হয় এবং নিজের বাহনে করে পাঁচ দিন সফর অব্যহত রাখে আর ৬ষ্ঠ দিন সকালে সে হাররা নামক স্থানে পৌঁছে। কালো পাথুরে ভূমিকে হাররা বলা হয় আর মদীনা দুইটি হাররার মাঝে অবস্থিত; একটি পূর্ব দিকের হার্ রা আর অপরটি পশ্চিম দিকের হার্রা। যাহোক, এরপর সে মদীনায় পৌঁছে মানুষের কাছে মহানবী (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকে। তাকে তাঁর

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

(সা.) সম্পর্কে অবহিত করলে পরে সে নিজের বাহনটিকে বেঁধে মহানবী (সা.)-এর কাছে যায়। তিনি (সা.) তখন বনু আব্দুল আশহাল গোত্রের মসজিদে অবস্থান করছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে দেখতেই বলেন, নিশ্চয় এই ব্যক্তির ধোঁকা দেওয়ার অভিপ্রায় রয়েছে, [অর্থাৎ তিনি (সা.) তার গতিবিধি দেখেই বুঝে ফেলেন;] আর আল্লাহ্ তা'লা তার ও তার অভিসন্ধির মাঝে প্রতিবন্ধক হবেন।

সুতরাং সে মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে গেলে হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.) তাকে তার চাদরের ভেতরের প্রান্ত ধরে টান দেন আর সহসা তার হাত থেকে ছুরিটি পড়ে যায় ও সে চিৎকার করতে থাকে যে, আমার রক্ত, আমার রক্ত! অর্থাৎ, আমাকে প্রাণভিক্ষা দাও! সে ধরা পড়ে যায়। হযরত উসায়েদ (রা.) তার ঘাড় ধরেন, এরপর তাকে ছেড়ে দেন। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, আমাকে সত্যি করে বলো, তুমি কে? সে বলে, আমি প্রাণভিক্ষা চাই। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে। তখন সে তার (মদীনায় আসার) উদ্দেশ্য ও আবু সুফিয়ান তার জন্য যা কিছু নির্ধারণ করেছিল সে সম্পর্কে বলে দেয়। অতঃপর মহানবী (সা.) তাকে মুক্ত করে দেন আর এই অনুগ্রহের পরিণতিতে সে মুসলমান হয়ে যায় এবং বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমি মানুষের ভয় করতাম না, কিন্তু যখন আমি আপনাকে (সা.) দেখি তখন আমার বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় আর (আমার) হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়ে। অতঃপর আমি আমার সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভাবলাম যা করার আমার দৃঢ় সংকল্প ছিল, যার জন্য অনেক আরোহী চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কেউ সফল হয় নি। আমি বুঝতে পারি যে, আপনার নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে এবং নিশ্চয় আপনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা আপনার সুরক্ষা করছেন আর আবু সুফিয়ানের সেনাদল শয়তানের সেনাদল। একথা শুনে মহানবী (সা.) মৃদু হাসেন। এরপর সেই ব্যক্তি কিছুদিন (মদীনায়) অবস্থানের পর মহানবী (সা.)-এর অনুমতি নিয়ে চলে যায়। এরপর সেই ব্যক্তির আর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় নি। পরবর্তীতে ইতিহাসেও তার সম্পর্কে আর কোনো উল্লখ পাওয়া যায় নি।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১২৩) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ:১০১-১০২)

আল্লাহ্‌র রসুল (সা.) আমর বিন উমাইয়্যা ও সালামা বিন আসলাম (রা.)-কে আবু সুফিয়ান বিন হারব-এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন এবং বলেন, তোমরা দুইজন তাকে অসতর্ক অবস্থায় পেলে তাকে হত্যা করবে।

[সে যেহেতু এমন ষড়যন্ত্র করেই যাচ্ছে তাই ঠিক আছে;তার প্রতিকার এটিই যে, তাকে নির্মুল করা হোক, যেন এই ঝগড়া-বিবাদ শেষ হয়।] ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) আমর বিন উমা ইয়্যা (রা.)-র সাথে জাব্বার বিন সাখ্‌র আনসারীকে প্রে রণ করেছিলেন। সুতরাং তারা উভয়ে সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে মক্কার কাছে পৌঁছে যান আর তারা উভয়েই তাদের উট দুটোকে ইয়াজেজের উপত্যকাগুলোর মধ্য থেকে একটি উপত্যকায় লুকিয়ে রাখেন, যা মক্কা থেকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল। অতঃপর তারা রাতের বেলায় মক্কায় প্রবেশ করেন। হযরত জাব্বার বা সালামা (রা.) আমর (রা.)-কে বলেন, আমরা যদি বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করতে পারতাম তাহলে কত ভালোহতো; দুই রাকআত নামায আদায় করতে পারতাম! হযরত আমর (রা.) বলেন, (মক্কার) লোকেরা রাতের খাবার শেষে তাদের উঠানে আসর বসায়। তারা আমাকে দেখামাত্রই চিনে ফেলবে। আমি মক্কায় সাদা-কালো ঘোড়ার থেকেও বেশি পরিচিত। অর্থাৎ অনেকেই আমাকে চেনে, আমার পরিচয় জানে। আমরের সঙ্গী বলেন, মোটেই না। ইনশাআল্লাহ্, আমরা (তওয়াফ করতে) যাব। আমর বর্ণনা করেন, সে আমার কথা মানতে অস্বীকার করে। এরপর আমরা বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করি এবং নামায আদায় করি। অর্থাৎ তারা সেখানে চলে যান। এরপর (তিনি) বলেন, আমরা আবু সুফিয়ানের উদ্দেশ্যে বের হই; অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে এসেছিলাম (তা) পূরণ করার জন্য (বের হই)। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মক্কায় হাঁটছিলাম। হঠাৎ মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আমাকে দেখে চিনে ফেলে। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, সে মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান ছিল যে চিনতে পেরেছিল। মুয়াবিয়া বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমর বিন উমাইয়্যা নিশ্চয়ই কোনো মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে (মক্কায়) এসেছে। সে কুরাইশদের বলে দেয়; তাদের আমরের বিষয়ে আশঙ্কা হয় আর তারা খোঁজার জন্য বেরিয়ে পড়ে। আমর বলেন, আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, দ্রুত পালাও। আমরা বেরিয়ে দৌড়তে আরম্ভ করলাম আর আমরা একটি পাহাড়ে আরোহণ করলাম। তারা আমাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল, তবে আমরা পাহাড়ে উঠে পড়েছিলাম। তারা আমাদের খুঁজে পায় নি আর আমরা পাহাড়ের একটি গুহায় প্রবেশ করলাম। আমরা সেখানে রাত্রি যাপন করলাম এবং আমরা পাথর নিলাম আর নিজেদের চতুর্পাশে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে রাখলাম। যখন ভোর হলো তখন কুরাইশের এক ব্যক্তি আমাদের নিকটবর্তী হলো। সেখানে কুরাইশের এক ব্যক্তিকে ঘুরাফেরা করতে দেখলাম। ইবনে সা'দের মতে সেটি উবায়দুল্লাহ্ বিন মালেক বিন উবায়দুল্লাহ্ তৈয়মি ছিল। কিন্তু ইবনে ইসহাকের মতে সে উসমান বিন মালেক আব্দুল্লাহ্ ছিল। সে নিজের ঘোড়াকে হাঁকিয়ে নিচ্ছিল। সে গুহার কাছে ছিল আর আমরা গুহার ভেতরে। আমি বললাম, যদি সে আমাদের দেখে ফেলে তাহলে সে চিৎকার করবে এবং আমরা ধরা পড়ে যাব আর মারা পড়ব। অর্থাৎ সে কাফিরদেরকে ডাকবে। আমার কাছে ছুরি ছিল যা আমি আবু সুফিয়ানের জন্য প্রস্তুত করেছিলাম। আমি বেরিয়ে তার বুকে আঘাত করলাম; এতে সে চিৎকার করে উঠল আর কুরাইশরা তার ডাক শুনতে পেল। আমি ফেরত আসলাম এবং গুহাতে প্রবেশ করলাম। লোকেরা তার কাছে ছুটে আসলো, সে সময় সে জীবন-মৃত্যুরসন্ধিক্ষণে ছিল। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাকে কে মেরেছে? সে উত্তর দিল, আমর বিন উমাইয়্যা। এরপর সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল এবং সেখানেই মারা গেল। কিন্তু সে আমাদের অবস্থান জানাতে পারল না।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, যখন তারা তার কাছে আসল তখন মক্কাবাসীদেরকে আমাদের অবস্থান জানানোর মতো শক্তি তার মাঝে অবশিষ্ট ছিল না। আমর বিন উমাইয়্যা বর্ণনা করেন, আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, তুমি নিজ প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যাও। তুমি নিজের উটের কাছে যাও এবং এতে আরোহণ করে চলে যাও।সে চলে গেল। আমর বিন উমাইয়্যা বলেন, অতঃপর আমি রওনা দিলাম আর যাজনান পৌঁছে গেলাম। যাজনান মক্কা থেকে এক বুরিদ অর্থাৎ বারো মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি পাহাড়। এরপর আমি একটি পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম এবং গুহায় প্রবেশ করলাম। এরপর সেখান থেকে বেরিয়ে আরয পৌঁছে গেলাম। আরয মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম যেখানে কাফেলা বিশ্রাম নিত। এরপর আমি বাহনে আরোহণ করে নাকী পৌঁছালাম। নাকী মদীনা থেকে দুই রাতের দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। এই দূরত্ব সীরাত ইবনে হিশামে লেখা আছে। সে সময় কুরাইশের দুই মুশরিককে দেখতে পেলাম তারা মদীনার দিকে আসছিল; তাদেরকে কুরাইশ গোয়েন্দা বানিয়ে পাঠিয়েছিল যেন অবস্থা ও ঘটনাবলি সম্পর্কে তদন্ত করে। আমি তাদের উভয়কে বললাম, তোমরা আত্মসম্পর্ণ করো; কিন্তু তারা অস্বীকার করল। আমি তাদের একজনকে তির নিক্ষেপ করে হত্যা করলাম এবং অন্যজন আমার কাছে আত্মসমর্পণ করল। আমি তাকে বেঁধে মদীনায় নিয়ে আসলাম। [স্বেচ্ছায়আত্মসমর্পণ করে নি বরং তাদের উভয়ের মাঝে যুদ্ধ হয়েছে সেখানে, পরস্পর তির বিনিময় হয়েছে।] যাহোক, আমর বিন উমাইয়্যা রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-কে নিজের অবস্থা ও পরিস্থিতি বলছিলেন আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃদু হাসছিলেন। এরপর তিনি (সা.) আমর বিন উমাইয়্যার মঙ্গলের জন্য দোয়া করেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১২৩-১২৫) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ৫৬ ,১৯৮ ,৩১৯) (যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২২৮)

এই সারিয়্যার বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়াত রয়েছে। ইবনে হিশাম, ইবনে কাসীর ও তাবারী প্রমুখ এই অভিযান চতুর্থ হিজরী সনে পরিচালিত হয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন; এতে হযরত খুবায়েব বিন আদী (রা.)-র লাশকে কাষ্ঠদণ্ড থেকে নামানোর উল্লেখ করেছেন। হযরত খুবায়েব (রা.) রাজী'র যুদ্ধে বন্দি হয়ে মক্কায় বিক্রি হন। কুরাইশরা তাকে কাঠের সাথে বেঁধে শহীদ করেছিল। কিন্তু ইবনে সা'দ আমর বিন উমাইয়্যার অভিযানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে কাঠ থেকে লাশ নামানোর উল্লেখ করেন নি। ইবনে সা'দের রেওয়ায়েত এক্ষেত্রে অধিক সঠিক মনে হয়। কেননা হযরত খুবায়েবের (রা.) লাশ নামানোর জন্য পৃথক একটি দলের যাওয়ার উল্লেখ পুস্তকসমূহে পৃথক স্থানে বিদ্যমান। যুরকানীও একই মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং আমর বিন উমাইয়্যার অভিযান শেষে তিনি লিখেছেন, খুবায়েব বিন

যুগ ইমামের বাণী

তোমাদের আদর্শ তারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কোনও ব্যবসা বা কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত রাখে না।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৬)

দোয়াপ্রার্থী: Jahan ara Begum, Bhagwangola, Murshdabad

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

আদীর লাশ নামানোর জন্য মহানবী (সা.) হযরত যু বায়ের এবং মিকদাদ (রা.)-কে প্রেরণ করেছিলেন। (সূত্র: যুরকানী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬৯)

এই বিষয়ে সীরাত খাতামান নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও (রা.) লিখেছেন, আমর বিন উমাইয়্যার এই অভিযানের বৃত্তান্তে তিনি খুবায়েব বিন আদীর লাশ কাষ্ঠদণ্ড থেকে নামানোর ঘটনা উল্লেখ করেন নি। তিনি যা লিখেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ হলো:

আহযাবের যুদ্ধের পরাজয়ের স্মৃতি মক্কার কুরাইশদের মনেপ্রাণে আগুন লাগিয়ে রেখেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই অন্তর্জ্বালা আবু সুফিয়ানকে বেশি পীড়া দিচ্ছিল যে মক্কার নেতা ছিল আর আহযাবের যুদ্ধে বিশেষভাবে লাঞ্ছনাকর পরাজয় বরণ করেছিল। কিছু সময় পর্যন্ত আবু সুফিয়ান ভিতরে ভিতরে জ্বলছিল, কিন্তু পরিশেষে বিষয়টি তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় আর সেই অগ্নির অদৃশ্য শিখা প্রকাশ্য রূপ লাভ করছিল। স্বাভাবিকভাবেই কাফিরদের মূল শত্রুতা, বরং বলা যায় প্রকৃত শত্রুতা ছিল মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তার প্রতি। এ কারণে তখন আবু সুফিয়ান এই চিন্তা করছিল, বাহ্যিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কৌশলে যেহেতু ফল হলো না, তাই এখন কোনো গোপন ষড়যন্ত্রের মাধমে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করে দেওয়া যাক। সে জানত, মহানবী (সা.)-এর আশেপাশে বিশেষ কোনো পাহারার ব্যবস্থাথাকে না, বরং কখনো কখনো তিনি একদম অরক্ষিত অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে আসা-যাওয়া করেন, শহরের অলিগলিতে ঘোরাফেরা করেন। মসজিদে প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচ বেলার নামায পড়তে আসেন। আর সফরেও সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিমতামুক্ত ও স্বাধীনভাবে থাকেন। একজন ভাড়াটে খুনির জন্য এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কী হতে পারে? এ চিন্তা মাথায় আসতেই আবু সুফিয়ান মনে মনে মহানবী (সা.)-কে হত্যার পরিকল্পনা আঁটতে শুরু করে।

সে যখন এ বিষয়ে পুরো সংকল্পবদ্ধ হয় তখন সে একদিন সুযোগ বুঝে নিজের অনুসারী কিছু কুরাইশ যুবককে বলে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোনো যুবক নেই যে মদীনাগিয়ে গোপনে মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবলীলা সাঙ্গ করবে? তোমরা জানো, মুহাম্মদ (সা.)প্রকাশ্যে মদীনার অলিগলিতে ঘুরে বেড়ায়। সে সব যুবক এ কথা শুনতেই তা লুফে নেয়। তাদের বিষয়টি পছন্দ হয়। এরপর বেশি দিন পার হয় নি, এর মাঝে এক বেদুঈন যুবক আবু সুফিয়ানের কাছে আসে আর বলে, আমি আপনার প্রস্তাব শুনেছি এবং আমি এ কাজ করার জন্য তৈরি আছি। [পূর্বে যেভাবে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সে ঘটনাকে মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও বর্ণনা করেছেন।] সে আরো বলে, আমি এমন এক অতি সাহসী ও শক্তিশালী মানুষ যার হাত থেকে কেউ ছুটতে পারে না আর যার আক্রমণ হয়ে থাকে আকস্মিক। আপনি যদি আমাকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করে সাহায্য করেন, তাহলে আমি মুহাম্মদকে (সা.) হত্যা করার উদ্দেশ্যে যেতে তৈরি আছি। আমার কাছে এমন একটি খঞ্জর রয়েছে যা শিকারী শকুনের গোপন ডানার মতো (লুক্কায়িত) থাকবে। অতএব আমি মুহাম্মদের (সা.) ওপর আক্রমণ করব, এরপর পালিয়ে কোনো কাফেলার সাথে মিশে যাব আর মুসলমানরা আমাকে ধরতে পারবে না। [পূর্বে যে ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছিল, সেই ঘটনাই তিনি (রা.) বর্ণনা করছেন।] এরপর বললো, আমি মদীনার পথঘাট সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখি। আবু সুফিয়ান বললো, খুবই ভালো কথা; আমরা তোমাকেই খুঁজছি। এরপর আবু সুফিয়ান তাকে দ্রুতগামী উট ও পথের খরচ ইত্যাদি প্রদান করে বিদায় দেয় এবং নির্দেশ দিয়ে বলে, এই কথাটি কারো সামনে প্রকাশ করো না।

মক্কা থেকে বেরিয়ে এ ব্যক্তি দিনের বেলায় লুকিয়ে এবং রাতে সফর করে মদীনার দিকে অগ্রসর হতে থাকে; ৬ষ্ঠ দিন মদীনায় পৌঁছে যায়। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর খোঁজ করতে করতে সোজা বনু আব্দুল আশহাল-এর মসজিদে পৌঁছে। তিনি (সা.) তখন সেখানে অবস্থান করছিলেন। সে দিনগুলোতে নতুন নতুন মানুষ মদীনায় আসত, যে কারণে কোনো মুসলমান তাকে দেখে সন্দেহ করে নি। কিন্তু মহানবী (সা.) যখনই তাকে নিজের দিকে আসতে দেখেন, [তিনি (সা.) তখন মসজিদেই ছিলেন;] তিনি (সা.) বলেন, এ ব্যক্তি কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। সে ব্যক্তি একথা শুনে আরো দ্রুত তাঁর (সা.) দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু একজন আনসারী নেতা উসায়েদ বিন হুযায়ের দ্রুত লাফ দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেন আর এই ধস্তাধস্তির মাঝে তার হাত সে ব্যক্তির লুকানো খঞ্জরের ওপর পড়ে যার ফলে সে ঘাবড়ে গিয়ে বলে, আমার রক্ত! আমার রক্ত! [এখানে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। কেবল চাদরই টান দেন নি, বরং রীতিমতো তাকে ধরে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন, যার ফলে তার হাত থেকে খঞ্জর বেরিয়ে যায়।] যাহোক, তারপর সে সশব্দে বলে ওঠে, আমাকে ক্ষমা করো। যখন তাকে কাবু করে ফেলা হয় তখন মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, সত্য সত্য বলো! তুমি কে এবং কী উদ্দেশ্যে এসেছ? সে বলে, আমার জীবন ভিক্ষা দিলে আমি সব বলে দেবো। অতঃপর সে পূর্ববর্ণিত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, ঠিক আছে, তোমাকে ক্ষমা করা হবে। সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করে, আবু সুফিয়ান তাকে এত এত পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এরপর এ ব্যক্তি কয়েক দিন মদীনায় অবস্থান করে এবং সানন্দে মুসলমান হয়ে মহানবী (সা.)-এর মান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আবু সুফিয়ানের এই হত্যার ষড়যন্ত্রের কারণে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্য ও দুরভিসন্ধি সম্পর্কে সতর্ক থাকাটা পূর্বের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি (সা.) তাঁর দুইজন সাহাবী আমর বিন উমাইয়্যা যামরী এবং সালামা বিন আসলাম-কে মক্কাভিমুখে প্রেরণ করেন। আর আবু সুফিয়ানের এই হত্যার ষড়যন্ত্র ও তার পূর্ববর্তী রক্তক্ষয়ী কার্যকলাপ দৃষ্টিতে রেখে তাদেরকে অনুমতি দেন, সুযোগ পেলে অবশ্যই ইসলামের এই যুদ্ধংদেহি শত্রুকে বিনাশ করে দেবে। কিন্তু উমাইয়্যা এবং তার সাথি মক্কায় পৌঁছালে কুরাইশ সতর্ক হয়ে যায়। আর এই দুইজন সাহাবী প্রাণ বাঁচিয়ে মদীনায় ফেরত আসেন। পথিমধ্যে তারা কুরাইশের দুইজন গোয়েন্দাকে পান যাদেরকে কুরাইশ নেতারা মুসলমানদের গতিবিধি এবং মহানবী (সা.)-এর অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করেছিল। আর এটি মোটেও আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, এই ষড়যন্ত্রও হয়ত কুরাইশের আরেকটি রক্তক্ষয়ী চক্রান্তের ছক হয়ে থাকবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় উমাইয়্যা এবং সালামা তাদের গোয়েন্দাগিরির কথা আঁচ করে সেই গোয়েন্দাদের ওপর আক্রমণ করে তাদের বন্দি করতে যান, কিন্তু তারা পাল্টা আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে একজন গোয়েন্দা তো মারা যায় এবং অপরজনকে তারা বন্দি করে মদীনায় নিয়ে আসেন।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৭৪১-৭৪৩)

অবশিষ্টাংশ আগামীতে বর্ণনা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

পাকিস্তানে বিরাজমান পরিস্থিতির জন্য আমি দোয়ার আহ্বান করে থাকি। এর ভয়াবহতা অনেক সময় সীমা ছাড়িয়ে যায়। প্রশাসন এবং সরকারও মনে হয় উগ্রপন্থি মোল্লাদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। প্রথমে মসজিদের মিনার ভাঙা, মেহরাব গুঁড়িয়ে দেওয়ার সংবাদ আসতো; এগুলো নিয়ে তাদের আপত্তি ছিল। কিন্তু গতকাল ডাস্কায় তারা রাস্তা বানানোর অজুহাতে প্রথমে নোটিশ পাঠায় যে, আমরা এতটুকু জায়গা নিয়ে নেব এবং সেখানে বুলডোজার চালিয়ে জায়গা খালি করব। এতে মসজিদের সামান্য কিছু অংশ, গোসলখানা ইত্যাদি পড়ার কথা। কিন্তু যখন বুলডোজার নিয়ে আসে তখন তারা মোল্লাদের কথায় গোটা মসজিদ ভেঙে ফেলে ও সেটিকে শহীদ করে দেয়। এই মসজিদটি অনেক পুরানো স্থাপনা; দেশভাগের পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। সম্ভবত হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। যাহোক, এরা বর্তমানে এতটাই সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে শীঘ্রই পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন এবং তাদের ষড়যন্ত্র তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর করুন।

সেজন্য আহমদীদের, বিশেষ করে পাকিস্তানের আহমদীদের অনেক দোয়া করা প্রয়োজন, এদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। একইভাবে ফিলিস্তিন ইস্যুতে যে শান্তিচুক্তি হতে যাচ্ছে- কেউ কেউ বলে হয়ে গেছে, কখনো বলে হয় নি; শান্তিচুক্তির পরও বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে। এ বিষয়ে কিছু লোক অযথাই আনন্দ প্রকাশ করছে। কিন্তু তাদের বোঝা উচিত, দাজ্জালী শক্তির কোনো বিশ্বাস নেই। তারা বলে এক আর করে আরেক। তাই এতটা সুধারণা পোষণ করার দরকার নেই। তাদের জন্য দোয়া করাও আবশ্যক এবং মুসলমানদের বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য চেষ্টাও করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম জাতিকেও সেই বোধবুদ্ধি দান করুন।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং পরে তাদের গায়েবানা জানাযাও পড়াব।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং অনুধাবন করে, সে ধনী; তার কোনও দারিদ্রের ভয় নেই।

(সুনান সাঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Wasia Begum, Harhari, Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত এবং জামাতের সঙ্গে যারা সম্পর্ক স্থাপন করে, আল্লাহ তা'লা তাদের পথ-প্রদর্শন করেন।

-খুতবা জুমা ২৪ মে ২০১৯

দোয়াপ্রার্থী: Noo Jahan Begum, Kolkata

প্রথম স্মৃতিচারণ মোকাররম শেখ মুবারক আহমদ সাহেবের। তিনি রাবওয়া সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার নাযের দিওয়ান ছিলেন। তিনি গত ১১ জানুয়ারি তারিখে সাতাত্তর বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। মরহুম মূসী ছিলেন, জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার দাদা শেখ মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব ১৯৩৮ সনে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি গুরুদাসপুর জেলার বাটালা তহসিলের কাথানাঞ্জালের অধিবাসী ছিলেন।

শেখ মুবারক সাহেব বি.এ বি.এড পাশ করার পর ৬৬ সন থেকে ৮১ সন পর্যন্ত প্রায় পনের বছর তালীমুল ইসলাম হাইস্কুলে সেবা প্রদান করেন। এছাড়াও পরবর্তীতে ১৯৭৩ যখন স্কুল জাতীয়করণ করা হয়, তখন তিনি পুনরায় বিভিন্ন স্কুলে সরকারি চাকুরি করেন; শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন এবং চল্লিশ বছর তিনি জামা'তের সেবা করেন। ১৯৮২ সনে তিনি খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) সমীপে ওয়াকফের আবেদন করেন এবং তার আবেদন মঞ্জুর হয়। অতঃপর ১৯৮২ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) শতবর্ষ জুবিলীতে তাকে নায়েব উকিলরূপে নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি নায়েব উকিলুল মাল হিসাবেও সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি সদর আঞ্জুমানের এডিশনাল নাযের বাইতুল মাল এবং পরবর্তীতে নাযের বাইতুল মাল হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। অতঃপর নাযের দিওয়ান ও নাযের রিশতানাতা হিসাবে দীর্ঘদিন তিনি জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন অঙ্গাসংগঠনেও কাজ করেছেন; আনসারুল্লাহ্‌র কায়েদ ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিভিন্ন বিভাগে মোহতামিমও ছিলেন।

তার ভাগ্নে ও জামাতা মুরব্বী সিলসিলাহ্ হুসান মাহমুদ সাহেব বলেন, মুরব্বীদেরকে তিনি সর্বদা উপদেশ দিতেন, খিলাফতের সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং আর্থিক বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করবে না। তিনি বলেন, নামায আদায়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। শেষ বয়সেও মসজিদে গিয়ে নামায আদায়ের চেষ্টা করতেন। জামা'তী ও ব্যক্তিগত সভাসমূহে সর্বদা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তাগিদ দিতেন এবং সর্বদা এই দোয়া করতেন যে, আমার সন্তানদেরকেও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখো। তিনি বলেন, আমি প্রতিটি বিষয় খলীফাতুল মসীহকে লিখি, কোনো কিছু গোপন করি না। কোনোভুল করলে সেটিও লিখি যেন সেটির সংশোধন হয়ে যায় এবং আমি লাভবান হই। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসেবে অতি উত্তমভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। যখন সদর আঞ্জুমানে ছিলাম আমিও তাকে দেখেছি, আমার সাথেও তিনি কাজ করেছেন। সর্বদা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়ে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ছিলেন। সাদামাটা জীবন কাটানো, অনাড়ম্বর জীবনযাপন এবং জামাতের কাজে পুরো সময় সময় দেওয়া ছিল তার বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ সময় এমন হতো যে, তিনি সফরে যেতেন আর সফর শেষ করে এসেই দফতরে বসতেন, সন্ধ্যায় পুনরায় সফরে বের হয়ে যেতেন। সর্বদা জামা'তের সেবা করার সুযোগ খুঁজতেন। তার সন্তানদের মধ্য থেকে কেউ তাকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেন; [তিনি একবারঅসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন, তখন;] উত্তরে তিনি বলেন, আমার মৃত্যুতেই আমার অবসর হবে। দপ্তরের অন্যান্য কর্মীরাও তার প্রতি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। তারা বলেন, সর্বদা আমাদের খেয়াল রাখতেন। প্রত্যেক বিষয়ে খোঁজখবর নিতেন আর তা সমাধা করার চেষ্টা করতেন। এমনকি আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনও (পূর্ণ করার চেষ্টা করতেন)।এমনিভাবে তিনি আরো লেখেন, পড়াশোনার প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল। আমি দেখেছি, বাড়িতে সবসময় পড়াশোনায় রত থাকতেন। হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.)-এর বইপুস্তক এবং মলফুযাত ইত্যাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করতেন আর নিজ সন্তানদেরও এবিষয়ে জোর তাগিদ দিতেন। জামা'তের আইনকানুন ও নিয়মনীতি সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান ছিল আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তিও তার মাঝে ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাকে বিশেষ যোগ্যতা দান করেছিলেন। যখন আঞ্জুমানের বিধিবিধান সংশোধন করা হয়, তিনি সেই কমিটিরও সদস্য ছিলেন। তখন তিনি দূরদর্শিতাপূর্ণ পরামর্শ দিতেন।

করাচির ইন্সপেক্টর বাইতুল মাল সৈয়্যদ দাউদ আহমদ সাহেব লেখেন, ২৩ বছর সময়কাল শেখ সাহেবের অধীনে অর্থ বিভাগে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। খুবই সুন্দরভাবে কাজ আদায় করে নিতেন। যেখানে ভুল হতো সেখানে শুধরে দিতেন আর যেখানে ভালো কাজ হতো সেখানে বাহবা দিতেন। দপ্তরের প্রত্যেক কর্মীদের ধারণা এটিই ছিল যে, শেখ সাহেবের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যেক কর্মীর পারিবারিক এবং কর্মস্থলের দুশ্চিন্তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন আর যতদূর সম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন। মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারে এক স্ত্রী, ছয় ছেলে এবং এক মেয়ে রয়েছে।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ কাতার নিবাসী মরহুম মোকাররম মুনির আদিলভী সাহেবের যিনি সম্প্রতি ৭৬ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। তার তিন ছেলে এবং এক মেয়ে সকলেই কাতারে বসবাস করেন।

মোসাল্লাম দারাভী সাহেব লেখেন, তার মাধ্যমেই আমি এবং আমার ভাই আহমদীয়া জামা'ত গ্রহণ করেছি। তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় মোবাল্লেগ, সুবক্তা, বিচক্ষণ এবং আহমদী তবলীগী সাহিত্যের লেখক। ১৯৮৪ সালের শুরুর দিকে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-র সাথে তার সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি বয়আত গ্রহণ করেন। তারপর এখানে অর্থাৎ লন্ডনে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন এবং লিকা মা'আল আরব এবং আরো কিছু প্রোগ্রামের অনুবাদ করেন। তিনি দশটির অধিক পুস্তক রচনা করেন যার মাঝে ৭টি পুস্তক আহমদীয়া জামা'তের তবলীগের বিষয়বস্তু সম্বলিত ছিল। অনেক দেরিতে এসেছেন কিন্তু জামা'তের জন্য অনেক কাজ করে গিয়েছেন। সিরিয়া জামা'তের সেক্রেটারি তবলীগ এবং সেক্রেটারি তা'লীম ও তরবিয়ত হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। ডজন ডজন সদস্য তার মাধ্যমে বয়আত গ্রহণ করেন। আরবের অনেক জনপদে তার মাধ্যমে আহমদীয়াত পৌঁছেছে। এ কারণে একবার আহমদী বিরোধীরা তার গাড়িতে আগুনও ধরিয়ে দেয়। তার ধর্মীয় তর্কবিতর্ক এবং তবলীগী বৈঠকের কারণে তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হয় যার ফলে ১৯৮৯ সালে আরব উপদ্বীপের অন্যান্য কিছু সদস্যদের সাথে তৎকালীন সরকারের আমলে কয়েক মাস কারাবন্দিও ছিলেন। সিরিয়ার পরিস্থিতি যখন খারাপ হতে থাকে তখন তিনি নিজ সন্তানদের সাথে নিয়ে কাতারে হিজরত করেন।

সিরিয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট ওয়াসিম সাহেব ে লখেন, অগণিত পুস্তক তিনি রচনা করেন যার দরুন আহমদী লাইব্রেরি সমৃদ্ধ হয়ে যায়। আহমদীয়াতের শিক্ষামালা তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল এবং স্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপন করেন। তার কারণে অসংখ্য মানুষ আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।বাসিল আদিলভী সাহেব লেখেন, মরহুম তার পুরো জীবন আহমদীয়া জামা'তের সেবায় কাটিয়েছেন। খিলাফতের একজন প্রকৃত প্রেমিক ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্(রাবে.)-র জন্য ইংরেজি থেকে আরবী অনুবাদ তিনি করতেন। আহমদীয়াতের একজন নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন। আহমদীয়াতের তবলীগ এবং প্রচার ও প্রসারের কাজের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। আর সিরিয়াতে অবস্থি ত অনেক আহমদীর হেদায়াতের কারণ হন। তবলীগের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমনও করেছেন। ২০১৩ সালে সিরিয়াতে অন্তঃকলহ বৃদ্ধি পেলে কাতার স্থানান্তরিত হন। সেখানে ফেসবুকে আহমদীয়াত এবং খিলাফত সম্পর্কে লিখতে থাকেন এবং আগ্র হীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তিনি একজন বাগ্মী সুবক্তা ছিলেন। কুরআন ও সুন্নত থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের সত্যতার দলিলপ্রমাণাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন। তিনি খিলাফতের মাহাত্ম্য এবং সুরক্ষায় ইংরেজি থেকে আরবী ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। তিনি স্বীয় অস্তিত্ব, ভাষা, কলম এবং জীবনকে আহমদীয়াতের প্রচার ও সুরক্ষার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। প্রতিকূলতার মাঝেও তার অবিচলতা এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণীর সত্যতার ওপর ঈমান আনয়নের কারণে তাকে নিজ আত্মীয়স্বজন এবং দামেস্কের সমাজে অনেক দুঃখকষ্টও সহ্য করতে হয়েছে।

নাযার আযীব সাহেব বলেন, আমি আদিলভী সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের সাথে পরিচিত হই। শ্রদ্ধেয় খালেদ ইযাম সাহেব তার দাজ্জাল সংক্রান্ত একটি বই কোথাও থেকে সংগ্রহ করেন। আমার সেই বইটি খুব ভালো লাগে। তিনি আমার সব দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেন। এরপর আমি তার বই 'কাতলে মুরতাদ' (ধর্মত্যাগীকে হত্যা) আর এরপর 'জিন্ন' সংক্রান্ত (বই) পাঠ করি। (অতঃপর) তার সাথে ফোনে যোগাযোগ করি। এরপর আমি এবং খালেদ ইযাম সাহেব বয়আত গ্রহণ করি। মরহুম জানার পর ভীষণ আনন্দিত হন।

কাতার জামা'তের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার ইমরান রহমান সাহেব বলেন, তিনি খুবই বিনয়ী মানুষ ছিলেন। জামা'তের নেযামের সাথে সর্বদা সুদৃঢ় সম্পর্ক রাখতেন। খিলাফতের সাথে তার ভালোবাসা ও আনুগত্য খুবই অসাধারণ ছিল। এখানে এমটিএ-র মাধ্যমে খুতবা শুনতেন এবং আমার

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" (খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

বিগত দুই দশকের অধিককাল যাবৎ আমি সরকার, রাজনীতিবিদ এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষকে তাদের নিজ নিজ গণ্ডিতে সামাজিক সংহতি সৃষ্টিতে এবং বিশ্ব-শান্তি ও সম্প্রীতি নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে আসছি।

দীর্ঘকাল ধরেই রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী বা সাধারণ জনগণ বিনা ব্যতিক্রমেই আমার এই দাবির সাথে একমত পোষণ করেছেন যে, আমাদের অবশ্যই শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে হবে।

যেকোন প্রধান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাই, তিনি হযরত ঈসা (আ.) হোন, মুসা (আ.) হোন বা খোদার অন্য কোন নবী হোন বা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই হোন না কেন, তাদের অনুসারীদেরকে সমাজের শান্তি নষ্ট করতে এবং অন্যায় বা আগ্রাসনের পথ বেছে নেওয়ার শিক্ষা প্রদান করেন নি। যদিও এটা সত্য যে, কতক চরম পরিস্থিতিতে তাদেরকে সীমিত শক্তি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু, সর্বদাই সেটির একমাত্র উদ্দেশ্যে ছিল যুদ্ধ ও নির্যাতনের অবসান।

যদিও অনেকগুলো সংঘাত বর্তমান বিশ্বে চলমান, এর মাঝে সবচেয়ে চিন্তাদায়ক ও ভয়ংকর হল ইসরায়েল ও হামাস এবং রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যকার যুদ্ধ। কেউ কেউ মনে করতে পারেন বা এভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়ে থাকবেন যে, ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের মধ্যকার যুদ্ধটি একটি ধর্মীয় যুদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে এটি একটি ভূ রাজনৈতিক এবং অঞ্চলগত সংঘাত। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ সকল যুদ্ধ সমাপ্ত করার একটি মাত্র উপায় রয়েছে, আর তা হল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা এবং যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে বহিঃশক্তির স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কাজ না করে সমতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৯ মার্চ ২০২৪ যুক্তরাজ্যের ১৮তম জাতীয় শান্তি সম্মেলনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) প্রদত্ত ভাষণ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম [আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি যিনি অযাচিত অসীম-দাতা, পরম দয়াময়।]

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু, আপনাদের সকলের ওপর শান্তি ও কল্যাণ বর্ষিত হোক।

সমাজে বিভাজন দুর করে বিশ্বে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা ও চিন্তাভাবনার জন্য আজ আমরা আবারও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছি।

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সতর্কবার্তা

বিগত দুই দশকের অধিককাল যাবৎ আমি সরকার, রাজনীতিবিদ এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষকে তাদের নিজ নিজ গণ্ডিতে সামাজিক সংহতি সৃষ্টিতে এবং বিশ্ব-শান্তি ও সম্প্রীতি নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে আসছি। সকল প্রকারের যুদ্ধ, সেটা ধর্মের নামে মিথ্যা সংঘাত হোক অথবা স্পষ্ট ভূ রাজনৈতিক সংঘাতই হোক, তার পরিসমাপ্তি কীভাবে ঘটাতে পারি, এ বিষয়ে আমি আমার মতামত ব্যক্ত করেছি। আমি কেবল বিভিন্ন জাতির মাঝে চলমান যুদ্ধ বন্ধের বিষয়েই জোর দিয়েই ক্ষান্ত হই নি, বরং স্থানীয় পর্যায়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যকার হতাশার বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করতে হয় এবং যে সকল দেশে গৃহ-যুদ্ধ বা অভ্যন্তরীণ বিবাদ বিদ্যমান সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তা নিয়েও কথা বলেছি। নিশ্চয়ই ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অস্থিতিশীলতা ও বিভক্তিকে লালনকারী বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ ও প্রভাবে অভ্যন্তরীণ সংঘাত অনেক সময় বাড়তে বাড়তে আঞ্চলিক যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে।সাম্প্রতিক দশকগুলোতে, আমরা কুয়েত, ইরাক, সিরিয়া এবং সুদানের ন্যায় দেশগুলোতে এমন হস্তক্ষেপের বিভীষিকাময় পরিণতি প্রত্যক্ষ করেছি। সর্বোপরি, আমি বার বার সতর্ক করে বলেছি যে, বড় বড় শক্তিধর দেশগুলোর অন্যায় নীতি এবং বিশ্বের অধিকাংশ এলাকায় বিদ্যমান অন্যায্য রাজনৈতিক, আইনি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান অসমতার এক জোয়ারের জন্ম দিচ্ছে, যার পরিণতিতে বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাহীনতার ক্ষেত্রে ইন্ধন জোগাচ্ছে।

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

দীর্ঘকাল ধরেই রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী বা সাধারণ জনগণ বিনা ব্যতিক্রমেই আমার এই দাবির সাথে একমত পোষণ করেছেন যে, আমাদের অবশ্যই শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু অনেকে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, এই অভিমতও ব্যক্ত করেছেন যে, বিদ্যমান বিবাদসমূহ বৈশ্বিক যুদ্ধে রূপ নিতে পারে এবং এমনকি নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ব্যবহারকেও উসকে দিতে পারে, আমার এই ধারণাটি ভুল। অনেকেই এটিকে অযথাই নেতিবাচক মনে করেছেন। দীর্ঘ একটা সময় যাবৎ, এমনকি যারা বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত, যেমন রাজনীতিবিদ, পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক সাংবাদিক বা বিশ্লেষক, তাদের উচ্চাভিলাষী চিন্তাভাবনার কারণে এবং বিশ্বকে এক রঙিন চশমা দিয়ে দেখার প্রবণতার দরুন অথবা হয়ত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের এক অক্ষমতার দরুন, তারা আমার সাথে সম্মত হন নি। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ক্রমবর্ধিষ্ণু ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোকে তারা আপাতদৃষ্টিতে জেনেও না জানার ভান করেছেন। হয়ত তাদের একেবারে সামনাসামনি উপস্থিত কঠিন বাস্তবতাকে তারা স্বীকার করতে চান নি। যেভাবে লোকে বলে, "অন্ধের জন্য রাত আর দিন সমান।"

অথচ আজ যেভাবে ইউরোপে, মধ্যপ্রাচ্যে এবং অন্যত্র যুদ্ধের দামামা বাজছে, তাতে তাদেরই অনেকে এখন এমন এক বৈশ্বিক যুদ্ধের সতর্কবার্তা উচ্চারণ করছেন যেখানে নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ব্যবহারে বিশ্বে অকল্পনীয় ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হতে পারে। এই বোধোদয় হওয়া সত্ত্বেও এখনও মনে হচ্ছে অনেকে এই বিরোধসমূহকে সমাপ্ত করতে যা যা করা প্রয়োজন তা করতে অনাগ্রহ দেখাচ্ছে এবং বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত অর্থে সোচ্চার কণ্ঠস্বরের আহ্বানে সাড়া দিতে অনীহা প্রকাশ করে চলেছে।

এমন পরিস্থিতিতে আমি আজকের আয়োজন সম্পর্কে যখন চিন্তা করছিলাম, তখন এটিও ভাবছিলাম যে, আমাদের পুনরায় এই স্থানে একত্রিত হওয়ার কোন যৌক্তিকতা আছে কিনা। আমাদের শান্তি এবং ন্যায়বিচার এর কথা বলে লাভটা কী? পরিবর্তন সাধন করার শক্তি ও ক্ষমতা যাদের হাতে তারা যদি বদ্ধপরিকর হন যে, আমাদের কথা তারা শুনবেন না? কঠিন বাস্তবতা হল, এমনকি সেই সকল প্রতিষ্ঠান যেগুলো বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা ও এর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেগুলোও আজ ক্রমশ অবান্তর হয়ে উঠেছে।

জাতিসংঘে ভিটো ক্ষমতার খর্বকারী প্রভাব

উদাহরণস্বরূপ, জাতিসংঘ দুর্বল এবং প্রায় ক্ষমতাহীন এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে যেখানে গুটিকতক প্রভাবশালী দেশ সকল ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিমতকে অগ্রাহ্য করে থাকে। প্রতিটি বিষয়ে দলিল-প্রমাণ ও যৌক্তিকতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে, দেশগুলো জোটবদ্ধ হয়ে আছে এবং তারা সেখানে তাদের নিজেদের স্বার্থ

অনুসারে ভোট দিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গুটিকতক রাষ্ট্রই নিয়ে থাকে, যাদের হাতে ভিটো ক্ষমতা রয়েছে। বিশ্বস্ততার সাথে শান্তি ও ন্যায়বিচারের পক্ষে কাজ করার বদলে, যখনই তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ব্যাহত হয়, তখনই তারা তাদের ভিটো ক্ষমতা তুরুপের তাসের মত ব্যবহার করে, আর তাদের সেই সিদ্ধান্ত অন্যান্য দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি চুরমার করছে কিনা, এবং অগণিত নিরীহ মানুষের মৃত্যু ও ধ্বংসের পথ রচনা করছে কিনা, তারা এর কোন পরোয়াই করে না।

যাহোক, এ সকল পিছুটান সত্ত্বেও, আমি অনুভব করেছি যে, আমাকে অবশ্যই কথা বলার এই সুযোগটি কাজে লাগাতে হবে; কেননা, ইসলাম মুসলমানদেরকে শান্তির অন্বেষণে কখনও পিছপা না হওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকে। ইসলাম আমাদেরকে সত্য বলতে শিক্ষা দেয়, যেন যখন আল্লাহ্ তা'লার সামনে জবাবদিহিতার মুখে পড়তে হবে তখন যেন একজন মু'মিন সত্যিকার অর্থে এই দাবি করতে পারে, সে তাঁর (আল্লাহ্'র) সৃষ্টিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে থাকে। এছাড়াও জেহাদ, যা এমন একটি শব্দ যা প্রতিনিয়ত ভুল বোঝা হয় ও মানুষকে বোঝানো হয়, এটি সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, সর্বোৎকৃষ্ট জেহাদ হচ্ছে নেতার সামনে সত্য কথা বলা এবং সাহসের সাথে বলা, বিশেষ করে তাদের সামনে যারা কঠোর হৃদয়ের অধিকারী, অন্যায়কারী ও নিষ্ঠুর। নিশ্চিতভাবে যদি দুর্বল জাতিসমূহ বা ব্যক্তিবর্গ, যেমন আমি, যাদের কোন রাজনৈতিক যোগসূত্র নেই, কথা বলার চেষ্টা করে, তখন তাদেরকে কদাচিৎ স্বীকৃতি দেওয়া হয়, আর যারা কথা বলেন তাদের ভোগান্তি ও নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ার ঝুঁকি থাকে।

এ সত্ত্বেও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ইসলামী শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং দুর্বল ও অন্যায়ের শিকার মানুষের অধিকার পুনরুদ্ধারে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমরা আগামীতেও ইনশাআল্লাহ্ আমাদের যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে তা দিয়ে আমাদের নাগালের মধ্যে অবস্থানকারী রাজনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্যদেরকে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করে যাবো। বস্তুত, শান্তি প্রতিপালনে এবং যারা ভীষণ শারীরিক বা মানসিক কষ্টের মধ্যে রয়েছে তাদের ভোগান্তি দূর করতে আমাদের জামা'তের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে আপনাদের অনেকেই সম্যক অবহিত আছেন।

বড় বড় সকল ধর্মই শান্তির বার্তা বহন করে

আর তাই এ ভূমিকা বর্ণনা করার পর আমি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমার মতামত ব্যক্ত করতে উদ্যত হয়েছি। ধর্ম সম্পর্কে যতটুকু বলা যায়, যেকোন প্রধান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাই, তিনি হযরত ঈসা (আ.) হোন, মূসা (আ.) হোন বা খোদার অন্য কোন নবী হোন বা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই হোন না কেন, তাদের অনুসারীদেরকে সমাজের শান্তি নষ্ট করতে এবং অন্যায় বা আগ্রাসনের পথ বেছে নেওয়ার শিক্ষা প্রদান করেন নি। যদিও এটা সত্য যে, কতক চরম পরিস্থিতিতে তাদেরকে সীমিত শক্তি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু, সর্বদাই সেটির একমাত্র উদ্দেশ্যে ছিল যুদ্ধ ও নির্যাতনের পরিসমাপ্তি।

ইসলামের ক্ষেত্রে, এর আভিধানিক অর্থই হল শান্তি এবং ইসলামের শিক্ষার প্রতিটি আঙ্গিক এই নামের প্রতিফলন করে। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনের ৪২:৪১ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দেন যে. যেখানে কোন ব্যক্তি বা জাতির সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে সেখানে তারা কোনভাবেই অসমভাবে তার প্রত্যুত্তর দেবে না অথবা প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে পথভ্রষ্টতার রাজ্যে প্রবেশ করবে না। এছাড়াও আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম, যদি তা সংশোধনের কারণ হয়। পবিত্র কুরআনের ৪৯:১০ আয়াতে বলা হয়েছে, যদি দুটি পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে নিরপেক্ষদের তাদের মাঝে মধ্যস্থতা করানো উচিত এবং ন্যায়বিচার ও সাম্যের নীতির ওপর ভিত্তি করে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করা উচিত। যদি সমঝোতার পর কোন পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করে এবং আবারও যুদ্ধে অগ্রসর হয়, তবে অন্যান্য পক্ষসমূহের আগ্রাসী পক্ষের বিরুদ্ধে জোরদারভাবে একতাবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করতে হবে, যতক্ষণ না সে তার আগ্রাসী আচরণ থেকে সরে আসে। একবার সেই পক্ষ যখন বিরত হবে, তখন অন্যান্য জাতিরও শক্তি প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।

টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হল ন্যায়বিচার

আমাদের লক্ষ্য সবসময় হওয়া উচিত ন্যায়বিচারের ভিত্তিমূলে টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা। এমন হওয়া উচিত নয় যে, তৃতীয় পক্ষ এসে যুদ্ধরত পক্ষসমূহের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাদের অধিকার হরণ করে। এ নীতি যদি জাতিসংঘ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থায় অনুসরণ করা হতো, তাহলে আরও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে এবং দ্রুততার সঙ্গে বিবাদসমূহের নিরসন হতো। কিন্তু প্রকৃত শান্তি অর্জন ততক্ষণ সম্ভব নয় যতক্ষণ দেশগুলো প্রত্যক্ষভাবে বা তাদের শক্তিশালী মিত্রদের মাধ্যমে, ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। পরিতাপের বিষয়, এর অন্তর্নিহিত ন্যায়বিচারের অভাবের কারণে, জাতিসংঘের পরিণাম মনে হয় এর ব্যর্থ পূর্বসূরী লীগ অফ নেশন্স এর অনুরূপ হতে চলেছে। আর যদি আন্তর্জাতিক আইনের বিদ্যমান কাঠামো, যদিও তা যথেষ্ট দুর্বল, যদি আজ সম্পূর্ণ ধসে পড়ে, তবে এর ফলে যে বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসযজ্ঞের সূচনা হবে তা আমাদের কল্পনারও বাইরে।

যদিও অনেকগুলো সংঘাত বর্তমান বিশ্বে চলমান, এর মাঝে সবচেয়ে চিন্তাদায়ক ও ভয়ংকর হল ইসরায়েল ও হামাস এবং রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যকার যুদ্ধ। কেউ কেউ মনে করতে পারেন বা এভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়ে থাকবেন যে, ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের মধ্যকার যুদ্ধটি একটি ধর্মীয় যুদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে এটি একটি ভূ রাজনৈতিক এবং অঞ্চলগত সংঘাত। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ সকল যুদ্ধ সমাপ্ত করার একটি মাত্র উপায় রয়েছে, আর তা হল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা এবং যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে বহিঃশক্তির স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কাজ না করে সমতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। অন্যথায় জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিক আইনের কোন উপযোগিতা থাকে না। আর এমনটি চলতে থাকলে শুধু একটি নীতিই টিকে থাকবে আর তা হল "জোর যার মুল্লুক তার।"

ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে যদি বলি, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার ভিটো ক্ষমতা রয়েছে, আর অপরদিকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার সূত্রে কার্যত ইউক্রেনেরও ভিটো ক্ষমতা রয়েছে। তাহলে কীভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন সমঝোতা হতে পারে, যখন উভয় পক্ষই কার্যত ভিটো ব্যবহার করতে পারে? যদি কেউ জানে যে কোন সমঝোতা পুরোপুরি নিজ অনুকূলে না হলেই তা ভিটো ক্ষমতা ব্যবহার করে সে স্থগিত করে দিতে পারে, তাহলে কোন পক্ষ নিজ অবস্থান থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণও সরতে প্রস্তুত কেন হবে?

গাজ্জাতে যা ঘটছে তা নিয়ে যদি বলি, যদিও ইসরায়েলী ও ফিলিস্তিনী উভয়ের সমর্থক রয়েছে, কিন্তু, গত কয়েক মাস আগে থেকে চলমান বর্তমান যুদ্ধে ভিটো ক্ষমতা কেবল ইসরায়েলের পক্ষে ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ফেব্রুয়ারি মাসে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৩ সদস্যই গাজ্জায় তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দিয়েছিল, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ভিটো দেয়, আর এতে তাদের এই প্রস্তাব পরাজিত হয়। এমনটি হলে শান্তি প্রতিষ্ঠা কীরূপে সম্ভব, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে এত সহজেই রদ করা দেওয়া হয়? এটি একেবারেই ন্যায়বিচার নয়, বরং এটি গণতন্ত্র ও সমতার নীতির প্রত্যাখ্যান।

ইসলামী শিক্ষা উচ্চাঙ্গের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে

এ সকল মানবসৃষ্ট আইনের বিপরীতে ইসলামী শিক্ষা ন্যায়বিচারের ওপর এতটা গুরুত্বারোপ করে যে পবিত্র কুরআনের ৫:৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোন জাতির বা ব্যক্তির শত্রুতাও যেন কখনও কাউকে ন্যায়বিচার ও সমতার পথ থেকে বিচ্যুত হতে প্ররোচিত না করে। এমন সততা প্রদর্শন করা খোদাভীরুতার অধিকতর নিকটবর্তী। ন্যায়বিচারের এই সর্বোচ্চ মানদণ্ড অবলম্বনের প্রজ্ঞা ও কল্যাণ ধর্মহীন ব্যক্তিরাও নিশ্চয় অনুধাবন করবেন। একই সঙ্গে আপনারা বিস্মিত হতে পারেন, যদি প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা এমনটিই হয় যেমনটি আমি বর্ণনা করছি, তাহলে কেন এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, ইসলাম একটি উগ্রবাদী ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে, সাম্প্রতিককালে কতক রাজনীতিবিদদের উত্তেজিত ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের কারণে এই বিতর্ক আবারও উঠে এসেছে। এ বিষয়ে এটি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যে কয়েকটি যুদ্ধ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর খলীফাগণ করেছিলেন তা সবকটিই রক্ষণাত্মক ছিল। মুসলমানদের ওপর ইসলাম-বিরোধীদের নির্দয় আক্রমণের পরও, বছরের পর বছর ধরে চলমান নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর পবিত্র কুরআন তাদের সর্বশেষ অবলম্বন হিসেবে আক্রমণ রুখে দাঁড়ানোর অনুমতি দিয়েছে। এই অনুমতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২২:৪০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যাদের ওপর যুদ্ধ অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের নিজেদের

যুগ খলীফার বাণী

যুবক খুদ্দাম ও আতফালদেরকে নিজেদের সাহচর্যের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। বন্ধুত্ব তাদের সাথে রাখুন যাদের মধ্যে ঈমান ও নিষ্ঠা রয়েছে, যারা অনৈতিক ও অশালীন কাজকর্মে লিপ্ত নয়।

(রোযনামা আল ফজল, অনলাইন, ২৯ শে নভেম্বর, ২০২২)

দোয়াপ্রার্থী: **Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum**

আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে; কারণ তাদের সাথে অন্যায় করা হচ্ছে এবং তারা নির্যাতন ও শোষণের শিকার হচ্ছে।

এছাড়াও পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, রুখে দাঁড়ানোর এই অনুমতি কেবল ইসলামকে রক্ষার জন্যই প্রদান করা হয়নি বরং সকল ধর্মকে রক্ষা করার জন্য এবং বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রদান করা হয়েছিল। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তিনি অন্যদের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘনকারীদের দমন না করতেন তাহলে গির্জা, উপসনালয়, মন্দির, মসজিদ এবং অন্যান্য উপাসনালয়সমূহ যেখানে নিয়মিত সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করা হয় তা ধ্বংস হয়ে যেত। তাই মুসলমানদের এই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, সকল ধর্ম এবং উপাসনালয়ের ক্ষতি করার পরিবর্তে সেগুলোর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করবে।

ইসলামের সমরনীতি আধুনিক বিশ্বের জন্য শিক্ষণীয়

উপরন্তু যেখানে রক্ষণাত্মক যুদ্ধের শর্ত পূর্ণ হয়েছে, সেখানে মুসলমান শিবিরে মহানবী (সা.)-এর প্রদত্ত কঠোর বিধি-নিষেধের অনুসরণে যুদ্ধ পরিচালনা করা হতো। প্রথমত, তিনি বলেছেন যে, কখনও ব্যক্তিগত বা হীন স্বার্থ পূরণ করতে, ভূমি দখল করতে অথবা অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে যুদ্ধ করা যাবে না। বরং মুসলমানদের লড়াইয়ের অনুমতি শুধু তখন দেওয়া হয়েছিল যখন তাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোথাও যুদ্ধ শুরু হলে অন্যান্য জাতিসমূহকে একত্রিত হয়ে আগ্রাসী পক্ষকে থামাতে হবে। এরপর যখন আগ্রাসী পক্ষ তার শক্তির ব্যবহার বন্ধ করবে, তখন অন্যান্য জাতিরও তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে। এছাড়াও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যুদ্ধাবসস্থায় বেসামরিক জনসাধারণের ওপর আক্রমণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, যা আধুনিক বিশ্বের যুদ্ধে একেবারেই সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি মুসলমানদেরকে আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, যুদ্ধের গণ্ডি যতটুকু সম্ভব সীমিত রাখতে হবে। যুদ্ধকে এলাকা বা ব্যবহৃত অস্ত্রাদির দিক থেকে সম্প্রসারিত বা দীর্ঘায়িত করার অপচেষ্টা এড়িয়ে চলতে হবে।

ইসলাম এ শিক্ষাও দেয় যে, যদি বিরোধী পক্ষ উপাসনালয়কে সামরিক ঘাঁটি না বানায়, এর ভিতরে বা এর কাছাকাছি যুদ্ধ না করে, তবে উপাসনালয়ের পবিত্রতা লঙ্ঘন করার কোন অনুমতি নেই। বিরোধীদের উপাসনালয় গুঁড়িয়ে ফেলা বা ধ্বংস করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এছাড়াও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শত্রু সৈন্যের লাশ বিকৃত করার পূর্ববর্তী রীতিকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং সেসকল মৃতদেহের প্রতি যত্নশীল ও সম্মানজনক আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এটিও শিখিয়েছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে কোন প্রকারের ছলচাতুরীর আশ্রয় নেওয়ার অনুমতি নেই। যেভাবে পূর্বেই বলেছি, নারী-শিশু, বৃদ্ধ ও অন্যান্য নিরীহ নাগরিকদের ওপর আক্রমণ করা যাবে না। একইভাবে পাদরি, ধর্মযাজক অথবা অন্যান্য ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের কোন প্রকার ক্ষতি করা যাবে না বা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে কোন বাঁধা প্রদান করা যাবে না।

এছাড়াও মহানবী (সা.) মুসলমান সেনাদের যুদ্ধের সময় বেসামরিক জনগণকে ভীত-শঙ্কিত করা বা তাদের মাঝে কোন প্রকার আতঙ্ক ছড়াতেও নিষেধ করেছেন। বরং, (তিনি এই নির্দেশনা দিয়েছেন যে,) সকল নিরস্ত্র ও বেসামরিক জনগণের সাথে অনুগ্রহশীল আচরণ করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অন্যায়-অবিচার করা যাবে না। এছাড়াও তিনি মুসলিম সেনাদলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এমন কোন শহরে বা এলাকায় সৈন্য শিবির বা ঘাঁটি স্থাপন উচিত নয় যেখানে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে উদ্বেগ ও অস্বস্তির সৃষ্টি হয়। তিনি (সা.) বলেন, যুদ্ধের সময়, বিরুদ্ধ-পক্ষের সৈন্যকে মুখে আঘাত করা যাবে না এবং তাদের জন্য যথাসম্ভব স্বল্প পরিমাণ ক্ষতি এবং কষ্টের কারণ হতে হবে। যদি যুদ্ধবন্দি নেওয়া হয়, তবে তাদের আত্মীয়স্বজন বন্দী হলে তাদেরকে একে অপর থেকে পৃথক করা যাবে না। উপরন্ত, যুদ্ধবন্দিদের আরাম নিশ্চিত করার জন্য সকল প্রকারের প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে; এমনকি তাদের আরাম ও প্রয়োজনকে বন্দীকারীর নিজের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। যদি কোন মুসলমান

কোন যুদ্ধবন্দির প্রতি কোন প্রকার নিষ্ঠুরতা বা কঠোরতা প্রদর্শন করার অপরাধে দোষী হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত বা ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে দিতে হবে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আরেকটি নির্দেশ ছিল অন্যান্য দেশের প্রতিনিধি অথবা বার্তাবাহকের সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করতে হবে। যদি তাদের পক্ষ থেকে কোন ভুলত্রুটি বা অভদ্রতার আচরণ হয়েও যায়, তবু শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার স্বার্থে সেগুলো উপেক্ষা করা উচিত

কাজেই এই হল যুদ্ধ পরিচালনার ইসলামী নীতি, আর মহানবী (সা.) বলেছেন, যদি কোন মুসলমান এই নীতিমালা ভঙ্গ করে, তবে সাব্যস্ত হবে যে, সে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করছে না, বরং নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ও পাশবিক আচরণ করার জন্য যুদ্ধ করছে। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মুসলমান রাষ্ট্র ও সরকারের এই ইসলামী নীতি অনুসরণ করা উচিত। ধর্মের উর্ধ্বে চিন্তা করলে, আমি মনে করি এই যুদ্ধনীতি যদি অমুসলিম রাষ্ট্রও অনুসরণ করে, তবে যুদ্ধ সংঘটিত হলেও, তার ফলস্বরূপ এমন সুগভীর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে না, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে থাকে। কাজেই সকল রাষ্ট্র যারা আজ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত, তারা পশ্চিমা রাষ্ট্র হোক, বা এমন রাষ্ট্র যারা ইসলামী বিশ্বের প্রতি বিদ্বেষ রাখেন, অথবা মুসলিম রাষ্ট্র, তাদের অনুধাবন করা উচিত যে, প্রকৃত শান্তি কেবল তখনই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যখন যুদ্ধ ও সংঘাত নিরসনের এই নীতিগুলো অনুসরণ করা হয়। নতুবা আজ আমরা আমরা এক ভয়াবহ বিধ্বংসী বৈশ্বিক যুদ্ধের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছি, যা সন্দেহাতীতভাবে এমন ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও রক্তপাতের কারণ হবে যা আমাদের কল্পনাকেও বহুদূর ছাড়িয়ে যাবে।

পশ্চিমা বিজ্ঞজনদের উপলব্ধি

যেভাবে আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, অনেকেই আজ একই উপসংহারে উপনীত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক জেফরি সাখ্স লেখেন, "পৃথিবী আজ এক নিউক্লিয়ার বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে, আর এর জন্য বিশ্বজুড়ে বর্ধিষ্ণু সংঘাতসমূহের কারণ সম্পর্কে পশ্চিমা রাজনীতিবিদদের সত্য স্বীকারে ব্যর্থতাও কম দায়ী নয়।" তিনি আরও বলেন, "পশ্চিমাদের এই মন্ত্রের মত বুলি আওড়ানো যে পশ্চিমারাই মহৎ আর রাশিয়া ও চীন এরা মন্দ- এটি স্বল্পবুদ্ধি ও ভয়াবহ বিপজ্জনক। এটি সাধারণ জনমতকে বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক বিষয় থেকে মোড় ঘুরিয়ে অন্যদিকে পরিচালিত করার অপচেষ্টা মাত্র।" অধ্যাপক সাখ্স আরও বলেন, "সবকিছুর উর্ধ্বে এই ক্রান্তিলগ্নে ইউরোপীয় নেতৃবর্গের ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল উৎসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত, যুক্তরাষ্ট্রের মোড়লগিরির প্রতি নয়, বরং এমন ইউরোপীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা সকল ইউরোপীয় দেশের নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখে, যার মাঝে ইউক্রেনও রয়েছে, বরং এর সাথে কৃষ্ণসাগরে ন্যাটো বাহিনীর সম্প্রসারণে আপত্তিকারী রাশিয়াকেও নেওয়া উচিত। এই পর্যায়ে সামরিক তৎপরতা নয়, বরং কূটনৈতিক তৎপরতাই ইউরোপীয় ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রকৃত পথ।"

ইসরায়েল ও হামাসের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধ ও সেখানকার মানুষের মানবেতর পরিস্থিতি বিষয়েও অনেক লেখালেখি হয়েছে, আর সেখানকার পরিস্থিতির দিনদিন অবনতি হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স, যিনি নিজেই একজন ইহুদী, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ইসরায়েলী সরকারে এহেন পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানান। তিনি বলেন, "নেতানিয়াহু ও তার দক্ষিনপন্থী সরকার যা ফিলিস্তিনের জনগণের সাথে করছে তা অবর্ণনীয় আর ভাষায় প্রকাশ করার মত না। প্রায় ২৫-২৬ হাজার মানুষ ইতিমধ্যে নিহত হয়েছে (এই সংখ্যাটি তখনকার যখন এই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল, বর্তমানে এটি আরও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে), যার দুইতৃতীয়াংশ নারী ও শিশু। ৬৫,০০০ মানুষ আহত হয়েছে। গাজ্জায় ৭০% বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ধ্বংস হয়েছে। ১৮ লাখের বেশি মানুষ আজ গৃহহীন, খোদাই ভাল জানেন তাদের কী হবে।" সিনেটর স্যান্ডার্স আরও বলেন, "এই মুহূর্তে, আর আমি আশা করি সবাই আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন, হাজার হাজার শিশু অনাহারে মৃত্যুবরণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, আর আমরা যারা যুক্তরাষ্ট্রে আছি, তারা পরোক্ষভাবে ইসরায়েলকে সমর্থন জুগিয়ে এর ভাগীদার হচ্ছি। আর ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এই নেতানইয়াহুর সরকারকে আর একটি ফুটো পয়সা দিলেও তা আমার জন্য অভিশাপের কারণ হবে।"

মধ্যপ্রাচ্যে কীভাবে একটি শান্তিচুক্তি হতে পারে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে সিনেটর স্যান্ডার্স বলেন, "এই এলাকার ইতিহাস ভয়াবহ। এর সাথে সম্পর্ক হলকস্টের (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গণহত্যা) যেখানে ৬০ লক্ষ ইহুদী হত্যা করা হয়েছিল, এর সাথে সম্পর্ক লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনীকে তাদের নিজ মাতৃভূমি থেকে বিতাড়নের, তবে দিনের শেষে ফিলিস্তিনে মানুষের নিজেদের একটি মাতৃভূমি থাকার অধিকার রয়েছে। কাজেই এখানে আমরা একটি দ্বৈত-রাষ্ট্র সমাধানের কথা বলছি।"

উদ্ধৃত দুইজন ছাড়াও আরও অনেক বিশ্লেষক এখন সেই একই সুরে কথা বলছেন যে পরিণতি সম্পর্কে আমি বিশ্ববাসীকে আরও অনেক আগে থেকেই সতর্ক করে আসছি। এটাতে আমি কোন আত্মতৃপ্তি বোধ করি না, বরং আমি মনেপ্রাণে চাই বেশি দেরি হওয়ার আগেই বিশ্ববাসীর যেন সুমতির উদয় হয় আর বিশ্বব্যাপি সংঘটিত সকল বর্বরতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটে। নিশ্চিতভাবে, এটি আমার অভিমত যে, ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে পূর্ণ যুদ্ধবিরতি হওয়া উচিত আর একই সাথে রাশিয়া এবং

ইউক্রেনের যুদ্ধেও। এরপর, তাদের স্ব স্ব মিত্র শক্তিগুলো তাদেরকে আবারো যুদ্ধের দিকে প্ররোচিত করার পরিবর্তে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সকল সদস্যের উচিত নিদারুণভাবে বিপর্যস্তদের সাহায্যার্থে ত্রাণ প্রচেষ্টা জোরদার করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং একটি স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সমঝোতা গড়ে তোলার জন্য মনোনিবেশ করা। এমনটি না করে আমরা যদি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করি, আর এই যুদ্ধকে বাড়তে দিই, তবে আরও অগণিত নিরীহ প্রাণের হানি ঘটবে, যদি আমরা নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে এই যুদ্ধগুলোকে আরও বাড়তে দিই, আরও অগণিত নিরীহ প্রাণের হানি হবে, আর নিশ্চিতভাবে, নিজেদের ধ্বংস ও দুর্দশার রূপকার হিসেবে ইতিহাসের বিচারে আমরা ধিকৃত হবো।

আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সুরক্ষা

কাজেই পরিশেষে বলছি, যদি আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে নিউক্লিয়ার যুদ্ধের তেজস্ক্রিয়তার কুপ্রভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করা থেকে রক্ষা করতে চাই, আর তাদেরকে বঞ্চনা ও গঞ্জনার জীবন থেকে দূরে রাখতে চাই আর যদি আমরা নিজেদেরকে তাদের অভিসম্পাত ও বিলাপগাঁথা থেকে নিরাপদ রাখতে চাই, তবে আমাদেরকে দ্রুততা ও প্রজ্ঞার সাথে সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং নীতিনির্ধারকদের কাছে যারা পৌঁছাতে পারেন তাদেরকে অন্যের ওপর নিজ আধিপত্য বিস্তারের হীন স্বার্থে অন্ধ না হয়ে মানবজাতির জন্য দীর্ঘ মেয়াদে কোন বিষয়টি কল্যাণকর তা দৃষ্টিতে রাখতে হবে। জাতীয়, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র স্বার্থ পাশে ঠেলে দিয়ে মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের জন্য এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহের জন্য আমরা যেন একটি সমৃদ্ধ পৃথিবী রেখে যাই এটি নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সকলকে একতাবদ্ধ হতে হবে। সময়ের দাবি এই যে, আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি এবং প্রচেষ্টা যেন সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত করি, যেন আমরা অসমতা, ঘৃণা ও রক্তপাত দ্বারা কলঙ্কিত এক পৃথিবীর বদলে আশা ও সমৃদ্ধির এক পৃথিবীতে বাস করতে পারি।

এ কথাগুলোর সাথে, আমি আগত সকল অতিথিকে এখানে এসে আমার কথা শোনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমার বক্তব্য দীর্ঘ করার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী, তবে বর্তমান বৈশ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে আমি একে প্রয়োজনীয় মনে করেছি। আপনাদেরকে ধন্যবাদ আর পুনরায় আপনাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

****

ওয়াকফাতে নওদের ইজতেমায় হুযুর আনোয়ারের ভাষণ (যুক্তরাজ্য, ২০২৪)

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজকে পুনরায় আপনারা আপনাদের ন্যাশনাল ইজতেমা উদযাপন করছেন, আলহামদোলিল্লাহ। ওয়াকফাতে নও হিসেবে এতে সেই সব মেয়েরা এর অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে তাদের পিতামাত তাদের জন্মের পূর্বেই ধর্ম-সেবার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। আপনাদের যাদের বয়স ১৫ বছর বা এর উর্ধ্বে তারা নিজেদের জীবন ধর্মের সেবায় অতিবাহিত করবেন বলে অঙ্গীকার নবায়ন করেছেন। এছাড়া আল্লাহ্ ত'লার কৃপায় এখন অনেক এমন মেয়ে আছেন যারা মা হয়েছেন, ফলে আপনারা পরবর্তী ওয়াকফে নও প্রজন্মের লালনপালন করছেন। এমন মায়েদের কাঁধে যে গুরু দায়িত্ব বর্তায় তা দ্বিগুণ বা দ্বিমুখী। আপনারা যে শুধু নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষাই করবেন, তা নয় বরং নিজেদের সন্তানসন্ততির মাঝে মূল্যবোধ সৃষ্টি করবেন বা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করবেন এবং এটি একজন ওয়াকফাতে নও-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। সত্যিকার অর্থে এ সকল মায়েদের প্রথম দায়িত্ব হল, আপনারা আপনাদের সন্তানদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন, যেন তাদের মাঝে ইসলামী মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। তারা যেন বড় হয়ে ইসলামের সেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। তাই আহমদী মায়েদের ব্যক্তিগত আদর্শ ও আচরণ তাকওয়াপূর্ণ ও পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এছাড়া এমন মহিলাদের দায়িত্ব হল, তারা নিজেদের স্বামীদেরকে সর্বদা তাকওয়ার সাথে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করবেন। কেবল তবেই আপনারা আপনাদের সন্তানদের উন্নত নৈতিক শিক্ষার ভিত্তিতে তরবিয়ত করতে পারবেন এবং উত্তম আদর্শে গড়ে তুলতে পারবেন। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাদের এক সুদৃঢ় সেতুবন্ধন রচনা করতে সক্ষম হবেন। এজন্য আবশ্যক হল আপনাদের ঘর যেন পুণ্যে ভরে থাকে, তাকওয়ায় ভরে থাকে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে যেন আপনাদের গৃহ সবসময় পূর্ণ থাকে। ওয়াকফাতে নও সদস্য হিসেবে আপনাদের সর্বদা নিজেদের ইবাদতের ইবাদতের সুরক্ষা করা উচিত। আপনারা যথাযথ সময়ে বিনয়ের সাথে নামায পড়ছেন কি না -তা নিশ্চিত করতে হবে। আর নিষ্ঠার সাথে আপানারা গভীর মনোযোগ দিয়ে নামায পড়ছেন কি না সেটাও দেখতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার সাথে আপনাদের যেন ভালবাসার এক সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি হয়। এছাড়া প্রত্যেক নামাযে আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনত হোন এবং আপনার সন্তানরা যেন তাকওয়াশীল এবং সত্যবাদী হিসেবে বড় হয়ে ওঠে এবং ধর্মের সাথে তাদের দৃঢ় সম্পর্ক তৈরী হয়- এজন বিশেষভাবে নামাযে দোয়া করুন। তাদের যেন খোদার সাথে এক চিরস্থায়ী সম্পর্ক বন্ধন রচিত হয় এবং তারা যেন ধর্মের সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে- এর জন্যও দোয়া করা আবশ্যক আর এভাবেই তাদেরকে গড়ে তুলুন। যে সকল ওয়াকফাতে নও-দের এখনও বিয়ে হয় নি, তারা প্রাপ্ত বয়স্ক লাজনা হোক বা নাসেরাত, তাদেরকেও বোঝাতে হবে-আল্লাহ্ তা'লার সাথে এক পবিত্র ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলা তোমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আর এর অন্যতম মাধ্যম হল নামায। দিনে শুধু দুই বা তিন বেলা নামায পড়ে নেওয়া কোন বড় বিষয় নয়। বরং সব নমায অর্থাৎ পাঁচ বেলার নামায মনোযোগ দিয়ে পড়া উচিত এবং আবেগ-আপ্লুত হয়ে নামায পড়া উচিত ও যথাসময়ে নামায পড়া উচিত। সব সময় দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আপনাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার তৌফিক দেন। আপনারা যেন পুণ্যবতী হয়ে বড় হতে পারেন-এজন্যও দোয়া করুন। খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভে সহায়ক পথ অবলম্বনের চেষ্টা করুন যেন ঐশী পুরস্কারে ভূষিত হতে পারেন। স্মরণ রাখবেন, আপনাদের ধর্মীয় লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কেবল দোয়ার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে এক নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এটি লাভ হতে পারে। এটি যদি আল্লাহ্‌র খাতিরে হয়ে থাকে তাহলে সকল প্রকার কুরবানী করতে সক্ষম হবেন। নতুবা শুধু ওয়াকফে নও স্কীমে অন্তর্ভুক্ত থাকা অর্থহীন। সেই সমস্ত পুণ্যবতী মহিলাদের আদর্শ থেকে শিখুন যারা আপনাদের পূর্বে ছিলেন। ইতিহাসের বহু এমন নারী রয়েছেন যারা আল্লাহ্‌র নবীর জন্য অসাধারণ কুরবানী দিয়েছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত ঈসা (আ.)-এর মহিলা সাহাবীরা অসাধারণ সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন, বিশ্বাসের খাতিরে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন। খৃষ্টানরা সেই সমস্ত পবিত্র মহিলাদের কুরবানী করে যারা অহর্নিশি হযরত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষার প্রচার করেছেন এবং সবসময় তাঁর শিক্ষার সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত ছিরেন। চরম পরীক্ষার মুহূর্তেও নিজেদের বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করেন নি। হযরত ঈসা (আ.)-কে যখন ক্রুশে চড়ানো হয় তখন তাঁর পুরুষ সাহাবীরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল কিন্তু মহিলা সাহাবীরা তাঁর প্রতি অনুগত ছিলেন। সমস্ত ভয়-ভীতি সত্ত্বেও, সরকারের পক্ষ থেকে ভয় থাকা সত্ত্বেও তারা নিজ বিশ্বাসে অটল ছিলেন। এমনকি হযরত ঈসা (আ.)কে ক্রুশ থেকে নামিয়ে তিন দিন যে কবরে রাখা হয়েছিল, তারা সেই কবর খুঁজে বের করেছিলেন। তারা তাঁর ক্ষত স্থানের চিকিসা করেছেন। তা নিরাময়ের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করেছেন। সে সব পবিত্র নারীরা নিজেদের বিশ্বাসের খাতিরে সব ধরণের ত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এছাড়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগেও নারীরা অসাধারণ কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন।ধর্মের অসাধারণ সেবা করেছেন। মুসলিম নারীরা ইসলামের সেবায় এমন উন্নত পর্যায়ে উপনীত ছিলেন যে, সব পুরুষদের জন্য তো বটেই, এমনকি সমগ্র মানবজাতির জন্য তারা ছিলেন আলোকবর্তিকা। সে সমস্ত পবিত্র নারীরা ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের উপর অসাধারণ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মের উপর আমল করাকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তারা যেন জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, নিজেদের ধর্মের প্রচারের জন্য যে সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন-তা অন্যদের সামনে অতুলনীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত উমর (রা.)-এর বোনের অসাধারণ বীরগাঁথা আমরা বার বার তুলে ধরি। তিনি শুধু মৌখিকভাবে কলেমা পড়েই ইসলাম গ্রহণ করেন নি, বরং তার সত্তার প্রতিটি বিন্দু, প্রতিটি কণা কুরআনের শিক্ষা শেখা এবং

যুগ ইমামের বাণী

অতএব, কুরআন শরীফ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া প্রধান ও আবশ্যক বিষয়।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum, From Latiful Haque Sb., Kandi (MSD)

যুগ খলীফার বাণী

সকল প্রকার অসত্য বচন ও প্রতারণার বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া এবং নিজেদের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আহমদী যুবকদের দায়িত্ব। [হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)]

দোয়াপ্রার্থী: Sujauddin Sk., Barisha, Kolkata

শেখানোর জন্য নিবেদিত ছিল। যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনি কুরআনের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। তিনি কুরআন শেখার জন্য মহানবী (সা.)-এর শিক্ষিত সাহাবীকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যেন সেই শিক্ষকের মাধ্যমে তিনি ও তাঁর স্বামী কুরআন শিখতে পারেন, কুরআনের অর্থ বুঝতে পারেন। আপনারা জানেন এমনই একদিনে (ইসলামের ভয়াবহ শত্রু) উমর তাঁর ঘরে আসে আর এসে বুঝতে পারে, তার বোন এবং স্বামী ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বাইরে থেকে কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। উমর তখন নিজের রাগ সংবরণ করতে পারেন নি। ক্রোধের বশে নিজ বোনের স্বামীকে ঘুসি মারে। কিন্তু তার বোন অসাধারণ বীরত্বের সাথে স্বামী ও ভাইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং ভাইয়ের প্রহার থেকে স্বামীকে রক্ষা করেন। এর ফলে অজান্তে একটি চপেটাঘাত বোনের গালে লাগে ফলে বোনের নাক থেকে রক্ত ঝরা শুরু হয়, কিন্তু বোন পিছপা হন নি। বরং অসাধারণ বীরত্বের সাথে এবং অকুতোভয় হয়ে তিনি বলেন, হে উমর! তোমার যা ইচ্ছে তা করতে পার কিন্তু আমরা কখনও ইসলামের শিক্ষাকে ত্যাগ করব না। তার বোনের অসাধারণ বিশ্বাস ও সাহস দেখে হযরত উমরের হৃদয় কেঁপে ওঠে। তিনি বোনকে আঘাত করেছেন এবং আহত করেছেন-এই ভেবে লজ্জিত হন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর রাগ প্রশমিত হয়। তখন বোনকে বলেন, আমাকে কুরআন দেখাও। তার বোন তাকে কুরআন দেখানোর ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রাখেন। এরপর তিনি আড়ালে থাকা মহানবী (সা.)-এর সাহাবীকে বের হয়ে আসতে বলেন। হযরত উমর যখন কুরআনের আয়াতগুলো শোনেন তখন কুরআনের শিক্ষার আলোয় তাঁর হৃদয় বিগলিত হয় আর সেই মুহূর্তে তার জীবন সম্পূর্ণ বদলে যায়। ইসলামের ঘোর শত্রু হিসেবে তিনি তার বোনের গৃহে এসেছিলেন কিন্তু সেখান থেকে তিনি যখন ফিরে যান তখন ইসলামের সত্যতা তাঁর হৃদয়ে গেঁথে যায়। এরপর তিনি সোজা মহানবী (সা.)-এর কাছে যান এবং ইসলামগ্রহণ করেন। এসব কিছু হয়েছে এক অসাধারণ মহিলার অসাধারণ সাহসিকতার কারণে যার বীরত্ব হযরত উমর (রা.)-কে ইসলামের গন্ডীভুক্ত করার কারণ হয়েছে। তাঁর (রা.) কারণে হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আমি ধারাবাহিকভঅবে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের সম্পর্কে যে খুতবা দিচ্ছি সেখঅনে আরও বেশ কয়েকজন মুসলিম নারীর কথা উল্লেখ করেছি যেমন হযরত উম্মে আম্মারা (রা.)। তিনিও ইসলামের খাতিরে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং অসাধারণ ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন। এসকল নারীরা বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন আবার অসহনিয় নির্যাতন সহ্য করেছেন। ইসলামের সেবায় তারা সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।তারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও আনুগত্যের মাঝে জীবন কাটিয়েছেন আর আগত সকল মুসলিম নারীর জন্য তারা অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত ছিলেন, বিশেভাবে আপনাদের মত নারীদের জন্য। তাই কুরআন পাঠ করা, কুরআনের শিক্ষাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া, আল্লাহর ভালবাসাকে হৃদয়ে গ্রোথিত ও প্রোথিত করা আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আমাদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হওয়া উচিত। এরূপ ভালবাসা সৃষ্টি করে আপনারা যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের শিক্ষাকে শিরোধার্য করবেন, তখনই কেবল আপনারা প্রকৃত মুসলমান হওয়ার দাবি করতে পারেন। কেবল তখনই আপনারা ওয়াকফাতে নও হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হবেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে সেই সামর্থ্য দান করুন আপনারা যেন ওয়াকফাতে নও হিসেবে নিজেদের অঙ্গীকারের প্রতি সুবিচার করতে পারেন। ওয়াকফে নও স্কীমের যথাযথ অংশ হতে পারেন। আর ইজতেমায় একত্রিত হয়ে শুধু এক অন্যের সাহচর্যে থেকে সময় কাটানোর কারণ না হন। সবাই এই ইজতেমা থেকে নিজেদের মাঝে অসাধারণ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পরিবর্তন আনার অঙ্গীকার নিয়ে ফিরে যাবেন। আপনারা নিজেদের জীবনকে সত্যিকার মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে সংকল্প করুন। আপনাদের মাঝে যেন আপনাদের বিশ্বাস সম্পর্কে এক দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে অর্থাৎ আপনাদের বিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস। ইসলাম সম্পর্কে যে সকল অহেতুক আপত্তি করা হয়, আপনারা সেগুলো খণ্ডন করবেন। আপনারা কখনও নিজেদের বিশ্বাস সম্পর্কে কোন প্রকার হীনম্মন্যতায় ভুগবেন না বরং আপনরা নিজেদের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয় করুন এবং নিজেদের জীবন ইসলামের সেবায় অতিবাহিত করুন। সাবালিকার পর্দা করুন, শালীন পোষাক পরিধান করুন এবং হিজাব ব্যবহার করুন। এটি চিন্তা করবেন না- মানুষ কি বলবে? হ্যাঁ! এটি সব সময় চিন্তা করুন-আপনি কে? আপনি কার প্রতিনিধিত্ব করছেন? কীসের প্রতিনিধিত্ব করছেন? সেই সম্পর্কে আপনার আত্মবিশ্বাস থাকা উচিত দৃষ্টি রাখুন যেন ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। কেননা এ যুগে ইসলামের মহান শিক্ষা সর্বত্র আপনাকে তুলে ধরতে হবে। নিঃসন্দেহে এটি ওয়াকফে নও মেয়ে ও মহিলাদের দায়িত্ব আর তাদেরকে তবলীগের ক্ষেত্রে অসাধারণ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে এমনটি করার তৌফিক দান করুন। পরিশেষে আমি দোয়া করি, আপনারা সবাই আপনাদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য পূণ্য করতে এবং বিশ্বাসের খাতিরে সকল প্রকার কুরবানী করতে সক্ষম হোন আর সমগ্র পৃথিবীবাসীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপ্লবের কারণ হোন।

****

সকল দেশেই নবীদের আবির্ভাব ঘটেছে

১৯০৮ সালের ০৫ মার্চ ভ্রমণকালে মৌলভী আবু রহমত সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করেন, হুযূর! শ্রী কৃষ্ণমহারাজের ধর্ম তো তাঁর নিজ বর্ণনামতে বর্তমান যুগের হিন্দুদের তুলনায় ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)বলেন: "একথা সত্য, পরবর্তী লোকেরা বুযূর্গদের শিক্ষা দীর্ঘ যুগঅতিক্রান্ত হবার কারণে ভুলে যায় আর তাদের সত্যিকার শিক্ষার মাঝে অনেক কিছু অযথাই প্রক্ষেপণ করা হয় এবং যুগের ব্যবধানের কারণে তাদের প্রকৃত শিক্ষার ওপর হাজার হাজার পর্দা পড়ে আর প্রকৃত বিষয় জগতের দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যায়।প্রকৃত বিষয় হল, শ্রী কৃষ্ণ মহারাজের ধর্ম বর্তমান যুগের হিন্দুধর্ম থেকে একেবারেই আলাদা এবং তৌহিদের খাঁটি শিক্ষা-সংবলিত ছিল। [এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)নিজের দুটি এলহামের উল্লেখ করেন] "কৃষ্ণ রুদ্রগোপাল! তেরী ম্যাহমা গীতা মেঁ লিকখি গায়ী হে" [অর্থাৎ তোমার মহিমা গীতায় লেখা হয়েছে] এবং 'আরিয়োঁ কা বাদশাহ্ আয়া' [আরিয়াদের বাদশাহ এসেছেন]। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও একটি স্বপ্নের উল্লেখ করে বলেন, 'একদা আমি শ্রী কৃষ্ণ-কে দেখেছি,তিনি কৃষ্ণকায় ছিলেন, নাক ছিল পাতলা এবং প্রশস্ত ললাট। শ্রী কৃষ্ণ উঠে নিজের নাক আমার নাকের সাথে এবং নিজের ললাট আমার ললাটের সাথে লাগিয়ে জুড়ে দিলেন।' হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,"খাজা বাকি বিল্লাহ্র সম্মুখে কোন এক ব্যক্তি নিজের স্বপ্নেরবর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি 'একটি আগুন' এবং রাজা শ্রী রামচন্দ্র সেই আগুনের কিনারায় আছেন এবং শ্রী কৃষ্ণমহারাজ আগুনের মাঝে আছেন।" উপস্থিত লোকদের মাঝে একব্যক্তি উক্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "তারা দু'জন যেহেতু কাফের ছিল তাই তারা আগুনের মাঝে পড়ে আছে। তবে একজন কম কাফের তাই সে আগুনের কিনারায় আছে আর অপর জন পাক্কা কাফের তাই সে আগুনের মাঝে পড়ে আছে।" তৎক্ষণাৎ মির্যা জান জানাঁ সাহেব যিনি খাজা সাহেবের মুরিদ ছিলেন, তিনি নিবেদন করেন, হুযূর! এই তা'বীর সঠিক নয়। খাজা সাহেব বলেন, তুমি এই স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা কর। তখন মির্যা জানা জানাঁ উক্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন, ঐ আগুন হল 'মোহাব্বতে এলাহী' অর্থাৎ ঐশী প্রেম, সেটি দোজখের আগুন নয়। শ্রী রামচন্দ্র সালেক ছিলেন, তিনি ঐশী প্রেমের চূড়ান্ত স্তর লাভ করেন নি তাই তাঁকে আগুনের কিনারায় দেখা গেছে কিন্তু শ্রী কৃষ্ণ মহারাজ বিমোহিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর ঐশী প্রেমের আগুনে গায়রুল্লাহ্ পুড়ে ছাই হয়ে যেত, এ ক্ষেত্রে তিনি চরম সীমায় উপনীত হয়েছিলেন তাই তাঁকে ঠিক আগুনের মাঝে দেখা গেছে। এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি (আ.) বলেন, "একদা আল্লাহ্র এক ওলী যিনি কাশফ দেখার সৌভাগ্য পেতেন, একদিন অযোধ্যা গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে একটি মসজিদে শুয়ে পড়েন। কাশফে দেখেন, শ্রী কৃষ্ণ আসলেন এবং তাঁকে সাত রুপি উপঢৌকন হিসেবে দিলেন আর বললেন, আমার পক্ষ থেকে দাওয়াতস্বরূপ কবুল করুন। সেই আল্লাহ্র ওলী যেহেতু মুসলমান ছিলেন তাই তিনি বললেন, তোমরা তো কাফের, আমরা তোমাদের সম্পদ খেতে পারি না। তখন শ্রী কৃষ্ণবললেন, আপনি কি বর্তমান হিন্দুদের অবস্থা ও ঈমানের সাথে আমাদের অবস্থা ও ঈমানের তুলনা করছেন? আমরা আদৌ এদের মত নই বরং আমাদের ধর্ম হল একত্ববাদ এবং আমরা ধর্মের দিক থেকে প্রায় আপনাদের সদৃশ। এছাড়া ইবনে আরাবীনিজ পুস্তকে লেখেন, একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'কানা ফিলহিন্দে নাবিয়্যান আসওয়াদাল লাওনে, ইসমুহু কাহেন' অর্থাৎ হিন্দুস্তানে একজন নবীর আবির্ভাব হয়েছিল যিনি কৃষ্ণকায় ছিলেনএবং তার নাম ছিল কাহেন। মুজাদ্দেদ আলফে সানী সারহিন্দী সাহেব বলেন, 'হিন্দুস্তানে কতক কবর এমন আছে যেগুলোসম্পর্কে আমি জানি, সেগুলো নবীদের কবর।' অতএব এইসকল ঘটনাবলি এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ, উপরন্তু পবিত্র কুরআন পাঠে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়, হিন্দুস্তানেও নবীরা আগমন করেছেন।যেমন পবিত্র কুরআনে বলা আছে, 'ইম মিন উম্মাতিন ইল্লা খালাফীহা নাযীরা' (সুরা ফাতের: ২৫)। হযরত শ্রী কৃষ্ণ ঐসকলনবীদের মধ্য থেকে একজন নবী ছিলেন যিনি খোদা তা'লার পক্ষথেকে প্রত্যাদিস্ট হয়ে মানবজাতির হেদায়াত ও জগতে তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগমন করেছিলেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, প্রত্যেক জাতিতে নবী আগমন করেছেন তবে তাদের সকলের নাম আমাদের জানা নেই- সেটি ভিন্ন বিষয়।" (মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃ. ১৪১-১৪৩)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 6 Mar, 2025 Issue No.10

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(খুতবার শেষাংশ...)

অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখতেন। আর এগুলোর কথা বার বার বলতেন। অর্থিক কুরবানীতে অগ্রগামী ছিলেন। এই বিষয়টি নিশ্চিত করতেন যে, তার চাঁদা যেন সর্বপ্রথম আদায় হয়। তিনি বলেন, মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বেও আমাকে এবং মুরব্বী সাহেব ও সেক্রেটারী মাল সাহেবকে নিজ বাসায় ডাকেন যে, তার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় করতে হবে, (যেন) এসে (তা) নিয়ে যাওয়া হয়। ভুল অভিযোগের ভিত্তিতে সেখানেও তাকে প্রশাসনের নিরাপত্তা বিভাগ থেকে তলব করা হয়, কিন্তু পরে ছেড়ে দেয়।

এরপর, তার সম্পর্কে কেউ একজন লিখেছেন, তাকে সিরিয়ার টিভি অনুষ্ঠানে কয়েকবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে তিনি ইসলামে মুরতাদের শাস্তি নিষিদ্ধের (বিষয়ে) বিশিষ্ট আলেমদের সাথে বিতর্ক করেছেন। এ কারণে তিনি প্রাণনাশের হুমকিও পান, যেগুলোর কতক অনলাইনে প্রকাশও করা হয়। তিনি একটি ফেসবুক পেজ -ও চালাতেন, যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলি থেকে নির্বাচিত অংশ শেয়ার করা হতো, যা আহমদী ও অআহমদী উভয়ই ফলো করত। তিনি তার সারা জীবন, নিজের শেষ নিঃশ্বাষ পর্যন্ত স্বীয় কলম এবং নিজ ভাষার ওপর অবিচল থেকে অতিবাহিত করেছেন। তার মৌলিক ও প্রধান চিন্তাভাবনা ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী পৌঁছানো এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লার সত্য ধর্মের বিস্তার ঘটানো। যেখানেই সুযোগ লাভ হতো সেখানে বসে আলাপচারিতাকে আহমদীয়াত এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা ও তাঁর বাণী প্রচারের দিকে মোড় ঘোরানোর সুযোগ হাতছাড়া হতে দিতেন না। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন, তার সন্তানদেরও পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন, পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো আব্দুল বারি তারেক সাহেবের, যিনি ওয়াকফে জাদীদ রাবওয়ার কম্পিউটার বিভাগের ইনচার্জ ছিলেন; সম্প্রতি তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

ওয়াকফে জাদীদের সদর সাহেব লিখেছেন, (তার পরিবারে) আহমদীয়াতের গোড়াপত্তন তার প্রপিতামহ শ্রদ্ধেয় চৌধুরী মুহাম্মদ ইয়ার সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল, যিনি শিয়ালকোট জেলার ঘাটিয়ালা নিবাসী ছিলেন। তিনি ১৯০৩ সালে একটি পত্রযোগে বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়াতে প্রবেশ করেন। মরহুমের দাদা চৌধুরী গোলাম কাদের সাহেব জন্মগত আহমদী ছিলেন। তিনি কম্পিউটার সায়েন্সে এমএসসি ডিগ্রিঅর্জন করার পর করাচিতে চাকুরি করতে থাকেন। তা রপর তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভের পর পুনরায় ক্যান্সার ফিরে আসে। অতঃপর তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র সমীপে (দোয়ার) লিখলে তিনি তাকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ পাঠান এবং হোমিও চিকিৎসার পাশাপাশি অন্য চিকিৎসাও চালিয়ে যেতে বলেন। একই সাথে তিনি ওয়াকফের আবেদনও করেছিলেন, এতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তা গ্রহণ করেছিলেন আর তাকে তাহরীকে জাদীদ দপ্তরে প্রেরণ করেন; এরপর ওয়াকফে জাদীদ দপ্তরে তার পদায়ন হয়। সবগুলো দপ্তর কম্পিউটারাইজ করা ছাড়াও জামা'তের অন্যান্য দপ্তরেও তিনি অনেক কাজ করেছেন। বরং পাকিস্তানের বাহিরে কানো আহমদীয়া হাসপাতাল, নাইজেরিয়া এবং বেনিনের আহমদীয়া হাসপাতালে কম্পিউটারাইজ করারও তিনি তৌফিক লাভ করেছেন। এমনকি কানোর ডাক্তার সাহেব তো লিখেছেন যে, আমরা কম্পিউটারাইজ করতে চাচ্ছিলাম যেখানে কয়েক লাখ টাকা খরচ হওয়ার কথা ছিল এবং অনেক দরদাম করেও আমরা যে এস্টিমেট পেয়েছিলাম- তা-ও ছিল হাজার ডলারের। কিন্তু তিনি এসে এক মাস অবস্থান করে অনেক কম অর্থ ব্যয়ে আমাদের সব কাজ করে দেন।

মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার মা, স্ত্রী, এক পুত্র এবং পাঁচ ভাই রেখে গেছেন এবং বোনও রয়েছে। তিনি যখন ওয়াকফ করেন; [অসুস্থতার পর তিনি সুস্থ হয়েছিলেন; তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন যে, সুস্থ হয়ে ওয়াকফ করব;] সুস্থতাও লাভ করেন এবং তিনি একুশ বছর পর্যন্ত নিঃস্বার্থ কাজ করেছেন; দিন আর রাত দেখেন নি। আর ওয়াকেফীনদের জন্য এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। কেন্দ্রীয় আনসারুল্লাহ্ বিভাগে তিনি কায়েদ হিসেবে কাজ করছিলেন; সে প্রেক্ষিতেই কোথাও সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তার হার্ট এটাক হয় এবং মৃত্যু বরণ করেন। আনসারুল্লাহ্‌র সদর ডাক্তার সুলতান সাহেব বলেন, তিনি ব্যবস্থাপনার এবং খিলাফতের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন আর তিনি তার ওয়াকফ পরিপূর্ণ রূপে বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছেন। ধর্মের সেবায় সর্বদা ব্যস্ত থাকায় তিনি আনন্দিত হতেন আর দায়িত্ব পালন করে শান্তি অনুভব করতেন। কেউ তাকে বলে, আপনি যে মানুষের কাজ করে দেন, এর জন্য তাদের কাছ থেকে পারিশ্রমিকও নিন। আপনি সফটওয়ার ইত্যাদি তৈরি করেন, এত পরিশ্রম করেন! এতে তিনি বলেন, আমি ওয়াকেফে যিন্দেগী আর আমার প্রতিদান খোদার কাছ থেকে লাভ হবে। যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, তিনি ওয়াকফের প্রেরণা নিষ্ঠার সাথে পূর্ণ করেছেন আর ওয়াকফের কল্যাণের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতেন; শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সেবা করার অঙ্গীকার করেছিলেন আর তা তিনি পূর্ণও করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন।

**** **** ****

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩রা জানুয়ারী, ২০২৫)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, আঞ্জুমান তাহরীকে জাদীদ, আঞ্জুমান ওয়াকফে জাদীদ কাদিয়ানের প্রতিষ্ঠানগুলিতে মালি/রাঁধুনি/নানবাঈ/কেয়ারটেকার/চৌকিদার হিসেবে খিদমত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি।

৪র্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের জন্য শর্তাবলী:

(১)প্রত্যাশীর বয়স ১৮ বছরের উর্ধ্বে এবং অনুর্ধ্ব ৪০ হতে হবে।

(২) শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই, তবে শিক্ষিত প্রত্যাশীদের প্রাধান্য দেওয়া হবে।

(৩) জন্ম-তারিখের জন্য স্বীকৃত শংসাপত্রের ফটোকপি দেওয়া আবশ্যক। (৪) ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে সমস্ত আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলি বিবেচিত হবে।

(৫) কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে।

(৬) ইন্টারভিউ এ উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নুর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে।

(৭) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে।

(৮)প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

(নোট: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ -এর দিনক্ষণ পরে জানানো হবে।) বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন-

(সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

Office: 01872-501130,Mobile: 9888232530, 09682627592

Email: diwan@qadian.in

تَرْكُ الدُّعَاءِ مَعْصِيَةٌ

(দোয়া পরিত্যাগ করা পাপ)

অর্থাৎ যারা মনে করে যে, খোদা তা'লা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছেন। অতএব তাঁর কাছে দোয়া বৃথা কর্ম, তাদের কাছে এই হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য।

যুগ খলীফার বাণী

যদি তোমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা এবং মানুষের মন জয় করতে চাও, তবে পবিত্রতা অবলম্বন কর, নিজেকে পরিছন্ন রাখ এবং নিজের উত্তম আচরণের নমুনা প্রদর্শন কর। তবেই তোমরা সফলকাম হবে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১লা জানুয়ারী, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir